দ্বিতীয় খণ্ড।

অনন্তলীলা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ধর্ম্মের বিচার।

এতদিনে সুরতবালার প্রতিহিংসার শেষ হইল! জ্ঞান ও মাধবী আপন আপন পাপের প্রতিফল পাইল। মিত্রদের অত বড় সংসারটা একেবারে ছারখার হইয়া গেল! কমলা, নীলু ও যদুকে লইয়া কাশীবাসিনী হইল। সৌদামিনী প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বর্দ্ধমানের বক্ষে আসিয়া বাটী ভাড়া করিল।

স্বর্ণলতার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না।—বাতে তাহার সর্ব্বশরীর পঙ্গু করিয়া ফেলিল। সে আর উঠিতে বসিতে, হাঁটিতে পারে না।—দিবারাত্রি কেবল শয়নে শয়নেই কাটে। সে চিরকালটা স্বাধীনভাবে কাটাইয়া আসিয়াছে, এখন কালব্যাপী ব্যায়রামে শয্যাগত হইয়া লোকের মুখাপেক্ষিণী, পরের হস্তে পুত্তলিকা! একে এই শরীরের রোগের যন্ত্রণায় অস্থির, তাহাতে আবার স্বকৃত পাপচিন্তানলে অন্তর নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছে। বরং—রোগের শোকের শান্তি এক মুহূর্ত্তও আছে, কিন্তু দুষ্কর্ম্মের—অনুতাপের শান্তি যে, আদৌ নাই। নিদ্রাবস্থাতেও হৃদয় ব্যাকুলিত, কলেবর কণ্টকিত করে। তাহার শ্বশুর বাড়ীর কেহই আর তাহার কোন তত্ত্ব রাখে না। আহা! যাহার জন্য

জীবন যৌবন উৎসর্গ করিয়া, পাপ-পুণ্যে জ্ঞান না রাখিয়া সতীত্ব রত্নে জলাঞ্জলি দিয়াছিল, সেই চিন্তামণি এখন আর একদিনের জন্যও স্বর্ণলতার নাম গন্ধ করে না। সুরতের উইলের মর্ম্মানুসারে মিত্রদিগের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল। মিত্রগোষ্ঠীর মধ্যে যিনি সংসারে রহিলেন, তিনি ঐ দানপত্রের নির্দ্ধারিত মাসহারার উপর নির্ভর করিয়া, জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতাও সেই সঙ্গে কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিল।

এখন সুরতবালা কোথায়? এ পর্য্যন্ত তাহার কেহ কোন সন্ধানই পাইতেছে না। যাহা হউক, সুরত আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। পতি-হন্তাকে প্রতিফল দিয়াছে। প্রাণপণে আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে। দুরাচার জ্ঞানকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছে। কত কৌশলে আপনার বিপুল সম্পত্তি ধূর্ত্ত প্রতারকের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, অবশেষে নিঃস্বার্থভাবে অকাতরে উপযুক্ত পাত্রে—উপযুক্ত ভাবে বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছে। সুরতবালা রমণীকুলের শিরোরত্ন। তাহার চরিত্র জগতের প্রকৃত দেবীপ্রকৃতি রমণীমণ্ডলীর আদর্শ।—ইহ সংসারে নারী হৃদয়ের সারবত্তা সুরতেই আছে।

সুরতসুন্দরী শ্রীমান রমেশ বাওয়াজীর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিত মাসহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছিল। বাওয়াজীও অনন্তপুরে থাকিয়া, সেই মাসহারাতে দিন গুজরান করিতে লাগিলেন। এইরূপে থাকিতে থাকিতে, বাওয়াজীর অনেকগুলি শিষ্য সেবক জুটিল। তন্মধ্যে আমিই বাওয়াজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম। কোথাও যাইতে হইলে, বাওয়াজী আমাকেই সঙ্গে লইতেন।—কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতে হইলে, আমাকেই ডাকিতেন! আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, নিত্য নিত্য নূতন নূতন মজা,—কত রহস্য,—কতই কাণ্ড দেখিতাম।—তাঁর কাছে সময়ে সময়ে কত কি শুনিতাম! কিন্তু তিনি আমা ভিন্ন আর কাহারও নিকটে এ সকল রহস্য প্রকাশ করিতেন না। আর আমিও প্রতিদিন যাহা দেখিতাম, যাহা শুনিতাম, সমস্তগুলি লিখিয়া রাখিতাম। এইরূপে কিছুদিন যায়; ইতি মধ্যে রমেশ বাওয়াজী হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন।—একদিন গেল, দুইদিন গেল, এক সপ্তাহ কেটে গেল, তথাপি তিনি ত প্রত্যাগত হইলেন না। তাঁর চেলারা, এখানে ওখানে, দেশে বিদেশে, কত অনুসন্ধান করিল, আমিও এপাড়া ওপাড়া যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া

বেড়াইলাম, কিন্তু কোথাও তাঁর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি যে কাহাকেও, বিশেষতঃ আমার মত ভক্ত ও সুবিশ্বাসী শিষ্যকেও, কিছুমাত্র না বলিয়া কহিয়া, কোথায়—কি কারণে চলিয়া গেলেন, তার কিছুই নিরাকরণ হইল না। সুতরাং আমিই কেবল এখন অনন্তপুরে একাকী বিরাজমান!—হতাশ্বাস হইয়া তাঁর অন্যান্য চেলারাও ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। যাহা হউক, বাওয়াজীর অন্তর্ধানের পর হইতে অন্য কেহ আর আমার কাছে ঘেঁসিত না। অগত্যা, আমাকে ভুষণ্ডি কাকের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল।

রমেশ বাওয়াজীর তিরোভাব হইল।—সেই সঙ্গে মিত্র মহাশয়দের অত বড় জাগ্রত রাধাকিষণজীর মাহাত্ম্যও, দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। কি জন্য ঠিক বলিতে পারি না,—সেজ বাবুর ও নবাবুর মর্ত্ত্যলীলা পরিত্যাগ করাতেই হউক, বা মিত্রপুরাঙ্গনাগণের ব্রজবিহারে যবনিকা পতনেই হউক, প্রভু রাধাকিষণজীর মহিমা একেবারে শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রভুর আর এখন সে পূর্ব্বের ভাব নাই। অতিথির জন্য কাষ্ঠের বোঝা বহিতে হয় না। শুক্তুনিতে ঝাঁল হইয়াছে বলিয়া পুদিনার চাটনির জন্য, অধিকারী ঠাকুরকে আরজী লিখিয়াও, পাঠাইতে হয় না। নিশীথ সময়ে, অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সহিত অনন্ত-মূর্ত্তিতে অনন্তলীলাতেও প্রমত্ত হইতে হয় না। প্রভুর সকল লীলা-খেলাই একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ওদিকে ত এই, এদিকেও সেইরূপ। আর এখন নাটমন্দিরে অষ্ট প্রহর নহবৎ বাজে না, গ্রামের গোঁড়া বৈষ্ণবেরাও আর এখন সকালে সন্ধ্যায়, পালে পালে—দলে দলে ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া—মাথার উপরে হাত খানেক শিখা ধ্বজা উড়াইয়া হরিনামের মধুর ধ্বনিতে গ্রাম সরগরম করেন না। পাড়ার অর্দ্ধ বয়সী ললিতা বিশাখারাও সকাল-সন্ধ্যায় মঙ্গল আরতি দেখিতে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লম্পট চূড়ামণি বাঁকা সখার প্রতি বাঁকা নয়নে চাহিয়া, বাঁকা কথায় আর নিজ নিজ রসিকতার পরিচয় দেয় না। এখন আর থালা থালা, বাটী বাটী মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ, বাড়ী বাড়ী বিতরিত হয় না। মিত্র বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে সকলই ফুরাইল! অত ধুমধাম,—অত জাঁকজমক, সব একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। এখন কেবল দিনান্তে রাধাকিষণজীর একবার পূজা ভোগ, আর সন্ধ্যাকালে ধরেদের বাড়ীর শ্রীধরের আরতির ন্যায় একবারটী যৎসামান্য আরতি হইয়া থাকে! সুরতবালার ঠাকুর

বাড়ীর সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল, সেই মতই চলিতে লাগিল। সুরতবালার কনিষ্ঠ দেবর স্মরদেব বাবু আসিয়া সুরতবালার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক হইলেন। সুতরাং, কোন বিষয়ে অন্যায় হইবার যো রহিল না। সকল বিষয়েই পরিমিত, ন্যায়সঙ্গত ব্যয়।

স্মরদেববাবু বেশ লোক। লেখা পড়ায়—কথা বার্ত্তায়, লোক-লৌকতায়—সকল বিষয়েই অতি যোগ্য পুরুষ। তাঁহার আকৃতি যেমনই সুন্দর, প্রকৃতি তেমনই সুমধুর। লোকের মানমর্য্যাদা রাখিতে, লোকের প্রতি দয়া ধর্ম্ম দেখাইতে, প্রাণপণে পরের উপকার করিতে তিনি ভালরূপই জানিতেন। তাঁর অন্তঃকরণে কোনরূপ খলকপটতা ছিল না। মুখভঙ্গিমা যেমন গম্ভীরতা প্রকটক, তেমনই সরলতাব্যঞ্জক। বিষয়কর্ম্ম,—জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র তিনি বিশেষ রূপ বুঝিতে পারিতেন। কেহ যে কোন বিষয়ে সহজে তাঁহাকে ঠকাইয়া যাইবে, তাহা কাহারও ক্ষমতায় হইত না। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকলেই সমাদর করিত, সকলেই মান্য করিত। তিনিও সকলের প্রতি অমায়িক ভাব দেখাইতেন। রাগ, হিংসা, অভিমান, অহঙ্কার কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। স্মরদেব বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইবে।—অদ্যাবধি বিবাহ নয় নাই।

সুরতবালার নিরুদ্দেশ হইবার পরেই, স্মরদেব বাবু আসিয়া সুরতবালার উইলের মর্ম্মানুসারে যাহাকে যাহা দান করিবার তাহা করিলেন। পরে, জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্বহস্তে বুঝিয়া লইলেন। জমিদারী শাসন সম্বন্ধে অনেক নূতন সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে তালুক কিম্বা মহল ছিল, তথায় নিজে যাইতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ভাল ভাল নূতন নূতন কর্ম্মচারী বাহাল করিলেন। তালুকের প্রজারাও সকলে মহাসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। যে মহলে অতিকষ্টে খাজনা আদায় হইত, সে মহলে এখন বিনা কথায়, বিনা ওজরে খাজনা আদায় হইতে লাগিল। যে মহলে হাজা ছিল, সে মহল তাজা হইল। যে মহলে বাস ছিল না, সে মহলে প্রজা বসিল। যেখানে নদীতে বাঁধ ছিল না, সেখানে বাঁধ বাঁধা হইল। প্রজারা মহা সন্তুষ্ট,—মহা আনন্দিত। স্মরদেব বাবুর খুব নাম খুব যশ বাড়িয়া উঠিল। সেই সঙ্গে জমিদারীর আয়ও অনেক বাড়ীতে লাগিল।

স্মরদেব বাবু আমাকে বড় ভালবাসিতেন।—আমি মধ্যে মধ্যে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়া বসিতাম। তিনি ইংরাজী সংস্কৃত দুই জানিতেন। ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁর অধিক অনুরাগ ছিল। আমাকে পাইলেই তিনি সংস্কৃতের কথা পাড়িতেন। আমার নিকট হইতে নানা বিষয়ের শ্লোক শুনিতেন।—সাহিত্যের দোষ গুণ লইয়া কখন কখন অলঙ্কার বিষয়ে তর্কও করিতেন। আমি যথাস্থানে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিতাম। আমি প্রথমে ইংরাজী জানিতামনা। তিনিই আমাকে একটু আধটু করিয়া ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন।

রমেশ বাওয়াজীর তিরোভাবের পর, এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি অনন্তপুরেই রহিলাম। আমার নাম সেখানে কেহ জানিত না,—কেহ কখন জিজ্ঞাসাও করিত না। আমিও কাহাকেও কিছু বলিতাম না। রমেশ বাওয়াজীর চেলা,—তাহাতে আবার গলায় একগাছ সুতা আছে, কাজেই সকলে আমাকে "গোঁসাইজী" বলিয়া ডাকিত। স্মরদেব বাবুও আমাকে "গোঁসাইজী" বলিতেন। কিন্তু আমি নিশ্চয়রূপে জানি যে, গোস্বামীদের সহিত আমার কোন পুরুষে কোন সম্পর্কই ছিল না। কেবল অনন্তলীলাময় পৃথিবীর এই অনন্তপুরে আসিয়া "গোঁসাইজী" হইয়াছি। কি করিব? আমার কোন দোষ নাই।—লোকে জোর করিয়া আমাকে "গোঁসাইজী" বলে। অগত্যা আমাকে সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। কি জানি;—কালের স্বধর্ম্মে যদি হিতে বিপরীত হইয়া উঠে, সেই জন্য লোকের যথেচ্ছা কথায়, আমি কোনও প্রতিবাদ করি না। "গোঁসাইজী" বলিলেই বা; মান্য ত করে? আমি ত আর গোস্বামীদিগের মত যাহার তাহার কাণে ফুৎকার দিয়া, কাহাকেও উদ্ধার করিতে যাইতেছি না। যেন তেন প্রকারেণ, নিজের কুতূহলাক্রান্ত কার্য্য উদ্ধার হইলেই হইল। আমার নামের বা আমার পরিচয়ের দরকার কি? আমার নামের চেয়ে, কাজের দরকার বেশী।

ভীমা রজনী।

দামোদর নদীর উত্তরকূলে বহুদিনের জীর্ণ একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। অট্টালিকাটীর বহির্ভাগে, প্রাচীরের গায়ে বালির লেশমাত্রও নাই। সময়চক্রে সকলই ঝরিয়া গিয়াছে। বহুদিন সংস্কারাভাবে ছাদের আলিসার স্থানে স্থানে ইট খসিয়াছে,—স্থানে স্থানে শৈবালমালায় ঘেরিয়াছে। স্থানে স্থানে অযত্ন-প্রোথিত অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি তরুরাজিগণ নির্ব্বিবাদে আপনাপন মূল দৃঢ়ীভূত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আলিসার উপরে, প্রাচীরের গায়ে, সেই সকল বৃক্ষের সুদীর্ঘ মূল সকল স্বদলে সবলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আলিসার নীচে, অট্টালিকার গাত্রস্থ গর্ত্তে, পেচক ও সারিকুল আপন আপন নীড় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, মনের সুখে কালযাপন করিতেছে।

অট্টালিকার পশ্চিমদিকে নিবিড় জঙ্গল। সে স্থানে বোধ হয়, পূর্ব্বে লোকজনের বাস ছিল। কারণ তথায় ভগ্ন গৃহাদির ভিত্তি সকল স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, ঐ জঙ্গলের অধিকাংশ বৃক্ষই বট ও অশ্বত্থ। সেই অত্যুচ্চ তরুরাজিগণ শাখা-প্রশাখায় অরণ্যভূভাগ এমত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে যে, মধ্যাহ্নকালেও তন্মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। অরণ্যের মধ্যস্থল গাঢ় অন্ধকারে ও নিবিড় কণ্টকলতায় সমাচ্ছন্ন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সামান্য পতঙ্গেরও তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার সুসাধ্য নয়! অট্টালিকার দক্ষিণে অবাস্তের পুষ্পোদ্যানের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে, কলকলনাদম দামোদর নদ যেন কুটিল কালকে ভ্রুভঙ্গি করিয়া উত্তাল তরঙ্গের দশন পংক্তি বিস্তার পূর্ব্বক, নৃত্য করিতে করিতে অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে অট্টালিকার পার্শ্বদেশ দিয়া, একটী অপ্রশস্ত পথ। সেই পথ দামোদরের স্নানের ঘাট হইতে গ্রামের রাজপথে আসিয়া মিশিয়াছে। স্নানের ঘাটটী অতি পরিষ্কার—অতীব সুন্দর। ঘাটের উপরে একটি চাঁদনী। চাঁদনীর দুই ধারে ঘাটে নামিবার সিঁড়ি। সিঁড়িটী দুভাগ হইয়া ঘাটের দুই দিকে গিয়া মিশিয়াছে। একটি পুরুষদিগের স্নানেরঘাট। অপরটি স্ত্রীলোকদিগের। দুই

ঘাটের মধ্যস্থিত প্রাচীর এত উচ্চ যে, এক ঘাট হইতে অপর ঘাটের কাহাকেও লক্ষ্য হয় না। গ্রামবাসীরা সকলেই এই ঘাটে স্নানাদি প্রভৃতি নিত্যকার্য্য সমাধান করিয়া থাকে। অট্টালিকাটীর উত্তরদিকে একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ। এই পথের দক্ষিণে অট্টালিকার প্রবেশ দ্বার আছে। বহুদিনে ও সংস্কারাভাবে, এই দরজা বা কপাট দুখানি জীর্ণ ও কতক কতক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং দ্বার এখন দিবারাত্রই উন্মুক্ত—সকলের পক্ষেই অবারিত। দ্বারদেশ পার হইলেই, একটী অপ্রশস্ত কঙ্করময় পথ। পথের দুধারে কাঠের রেলিং। রেলিঙ্গের দুধারে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে, নানা লতাগুল্মময় একটী বন জন্মিয়াছে। আহা! যে স্থানে ভোগবিলাসী, সুখাভিলাসিগণ একদিন মনের সুখে, সায়ং সমীরণ সেবন করিয়া, শরীরের স্বচ্ছন্দতালাভ করিয়াছেন, সেই স্থানে এক্ষণে অরণ্য জন্তুদিগের বিহার ভূমি হইয়াছে। কালের কি বিচিত্র মাহাত্ম্য।

সেই অরণ্য-পরিণত লতাকুঞ্জের দুই পার্শ্বে দুইটী সুবিস্তৃতা দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা দুইটীও যেন পার্শ্বোপরি পুষ্পোদ্যানের সমদুঃখভাগিনী হইয়াই, প্রস্ফুটীত কমলাভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে শৈবালাবরণে সর্ব্বাঙ্গ সংবৃত করিয়া বিষাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হয় যে, বহুদিন সেস্থানে জনমানবের সমাগম নাই।

পূর্ব্বোক্ত সেই কঙ্করময় পথটী একেঁ বেঁকে—সরু মোটা হয়ে, ক্রমশঃ বাটীর সিংদরজায় মিলিত হইয়াছে। সিংদরজা পার হইলেই নাট বাঙ্গলা, ঠাকুরবাড়ী; তার পরে দাওয়ানখানা, তোষাখানা,—তার পর বাড়ীর পূজার উঠান। উঠানটী চক মিলান, চারিদিকে দোতালা, মধ্যস্থলে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা। আটচালার সম্মুখেই ঠাকুরদালান, সাত পুকুরে প্রকাণ্ড দলান। দালানের থামগুলি চৌদ্দপলে, তাহাতে পাথরে রঙ্গের বাহারের কাজ করা। সেই দালানে একটী বিগ্রহ, সোনার দোল-চৌকিতে সোনার সিংহাসনে বিরাজমান। সিংহাসনটীর চারধারে মতি-মুক্তার ঝালর। দোল চৌকীর উপরে, সোনার কাজ করা এখানি বৃহৎ চাঁদোয়া খাটান। দেওয়ালের গায়ে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্রপট।—কোনখানি রামরাজা, কোনখানি কৃষ্ণকালী, কোনখানি কালীয়দমন, কোনখানি ব্রজবিহার, কোনখানি রাই-রাজা—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোন খানিতে নবনীত হস্তে যশোমতী শশব্যস্তে দ্বারদেশে অশ্রুনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া

দাঁড়াইয়া আছেন।—এইরূপ কত শত দৃশ্যপটে দালানটী সুশোভিত।—ইহার ভিতর দিকের একপাশে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী! সেটী বোধ হয়, বোধন ঘর।

ঠাকুর-দালানের একপার্শ্ব দিয়া অন্দরে যাইবার পথ! আর একপাশে ভোগবাড়ী। অন্দরের ভিতর তিনটী মহল। তিনটী মহলই বেশ চকমিলান দোতলা। অন্দর মহলের পশ্চাদ্ভাগে একটী রমণীয় কুসুম কানন। তন্মধ্যে দিব্য একটী সরোবর। বাটীর বহির্ভাগের দীর্ঘিকা দুইটির ন্যায়, এ সরোবরটী শৈবাল জঞ্জালে একেবারে সমাচ্ছন্ন হয় নাই। অবাস্তের পুষ্পোদ্যানটী অতি মনোহর। ষড়ঋতুভোগ্য নানাজাতীয় ফলফুলে পরিপূর্ণ! গোলাপ-মল্লিকা-বেল-যুঁই-চম্পক প্রভৃতি প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভে চতুর্দ্দিক প্রমোদিত! পিপাসু মধুকরগণের সুমধুর গুঞ্জনে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত!

বেলা অপরাহ্ন। সন্ধ্যা হয় হয়। বাগানের একপার্শ্বে সূর্য্যসোহাগী সূর্য্যমুখী প্রাণপতিকে, লজ্জাহীনা কমলিনী অনুরাগে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া নিজেও লজ্জার মাথা খাইয়া, কুটিল কটাক্ষে দিনমণির প্রতি এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যদেব সমস্ত দিনেও, কাহারও মনস্তুষ্টি পূর্ণ করিতে না পারায়, রাগে রক্তিমাবর্ণ হইয়া, তাঁহাদিগকে বিরহজ্বালা দেওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া তাহাদের নয়নের অন্তরালে যাইতেছেন। তখনই কোথা হইতে অন্ধকাররূপিণী চিরসঙ্গিনী ছায়াসতী, সপত্নীদিগকে ম্লানমুখী করিয়া, তাহার কর ধারণ পূর্ব্বক অনেক বুঝাইয়া, শান্ত করিয়া আস্তে আস্তে পশ্চিমাচল গৃহে নামাইয়া লইয়া গেলেন। ক্ষীণা সূর্য্যমুখী দেখিয়া শুনিয়া মনের দুঃখে মাথাটী হেঁট করিল। এদিকে কমলিনী সুন্দরী স্ত্রীসুলভ লজ্জায় ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জগৎ ঘোর কালিমায় জড়িত হইল!

ক্রমে ক্রমে একদণ্ড, দুইদণ্ড করিয়া, রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর কাটিয়া গেল। অমাবস্যার রাত্রি। তাহাতে কালদোষে দিঙ্‌মণ্ডল ঘোর-ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। আকাশে একটীমাত্রও তারকা দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল চতুর্দ্দিকে অন্ধকার! দেখিলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতি সুন্দরী এই ভয়াবহ তামসীবাস পরিধান করিয়া, জগতের পাপাচারী মানবগণকে বিভীষিকা দেখাইতে বসিয়াছেন। এই রাত্রিতে অবাস্তের পুষ্পোদ্যানের কি দৃশ্য!

একে অমানিশা তাহাতে বৈশাখের ঘনমেঘজালে দিঙ্‌মণ্ডল গাঢ় অন্ধকার! আবার ক্ষণপ্রভা প্রভা বিস্তার করিয়া সেই অন্ধকারকে আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। সম্মুখে সকল্লোল দামোদর তরঙ্গ তুলিয়া আমোদভরে চলিয়াছে। পশ্চিমদিকের দুর্গম, দুর্ভেদ্য নিবিড় অরণ্যে ঝিল্লীগণ ক্রমাগত তান ধরিয়া যেন প্রকৃতিদেবীর স্তব করিয়া, গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। ক্ষুদ্র খদ্যোত-খদ্যোতিকাগণ যেন অমানিশাকে উপহাস পূর্ব্বক সগর্ব্বে আলোকচ্ছটা দেখাইয়া বেড়াইতেছে। এমন সময়ে অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যানে অন্ধকারকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, ভীমা রজনীর গভীর দ্বিতীয় যামে, সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার অন্তঃপুরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া একটী দীর্ঘাকায় যুবাপুরুষ আপাদমস্তক কৃষ্ণ-পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, কুসুম-কানন ভিতর প্রবেশ করিলেন। অনন্তর একটী গুপ্তদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, অতি সতর্কভাবে দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক, উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন;—দেখিতে দেখিতে যুবা নদীতীরে উপনীত হইলেন! নদীবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী ছিল। যুবা নদীতীরে দাঁড়াইয়া, সঙ্কেতসূচক শব্দ করিলেন। তরণীতে একজন আরোহী ছিল। বোধ হয়, সে ব্যক্তি এতক্ষণ ইহাঁরই অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে সঙ্কেত বুঝিয়া, ধীরে ধীরে নৌকাখানি তীরে আনিয়া লাগাইল। যুবাও ত্বরিতপদে নৌকায় আরোহণ করিলেন! নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। নৌকা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া, যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

করগোষ্ঠী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত পুরাতন প্রকাণ্ড অট্টালিকাটী অনন্তপুরের করেদের। ইহাঁদের এখানে সাতপুরুষের বাস। ইহাঁরাই এখানকার আদিমবাসী। ইহাদের দেখাদেখি, মিত্র ও ধরেরা এখানে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে করেদের এখানে খুবই নামডাক, খুবই দপদপা ছিল।—এখন আর ততটা নাই। তবুও মরা হাতী লাখ টাকা! এখনও যে জমী-জারাত, বিষয়-আশয় আছে, তাহা অন্যের পক্ষে অগাধ! এখনও, ত্রিশ বত্রিশ লক্ষ টাকা জমিদারীর আয়! এখনও দেশ বিদেশে মান-সম্ভ্রমটা বড় কম নাই।

উদ্ধবকর গত হওয়ার পর হইতেই, করগোষ্ঠীদের পড়্‌তা খারাপ হইল। তাঁহার সময়ে, প্রজাদের ষড়যন্ত্রে দুখানি তালুক লাটে বিকাইয়া যায়। তিন চারিবার কিস্তির টাকা মারা যায়। তাহার পর, আর একবার, একটী মাম্‌লাতেও অনেক টাকা নষ্ট হয়। এইরূপে করেদের অনেক বিষয় উড়িয়া গেল। উদ্ধব করের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র লোকনাথ কর অনেক গুছাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরলোক গমন করিলে পর সমস্ত বিষয়টী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

লোকনাথ করের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ মাধব, মধ্যম রমানাথ, কনিষ্ঠ বলরাম। মাধব কর যেমন রূপবান, তেমনই গুণবান ছিলেন। লোকলৌকতায়, কথা-বার্ত্তায়, দয়া-ধর্ম্মে পরোপকারে, বিদ্যাবুদ্ধিতে সকল বিষয়েই অতুলনীয়।—কিন্তু তিনি কোন বিষয়ের মারপ্যাচ, ফেরফার বড় একটা বুঝিতেন না, খলতা কপটতার ধারেও যাইতেন না! বড় সরলবুদ্ধির লোক ছিলেন। মধ্যম রমানাথের স্বভাব সেরূপ ছিল না। তিনি লেখা-পড়ায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ তত সরল ছিল না। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন প্রখর, তেমনি কুটিল ছিল। কাহাকেও তিলার্দ্ধের জন্য বিশ্বাস করিতেন না। সহজে কেহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিত না। এক কথায়, মেজ বাবুটি একজন মস্ত চালাক, তুখোড় ধড়িবাজ লোক ছিলেন। সকল কাজেই নিজের স্বার্থটুকু ভালরূপ বুঝিতেন। যাহাতে স্বার্থ

নাই, তাহাতে হাত দিতেন না। অহঙ্কারটী পদে পদে ছিল। লোকব্যবহারটা ভালরূপই জানিতেন। কাহার সঙ্গে কিরূপ চালে চলিতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কথায় হউক, অর্থে হউক, লোক বশ করিতে খুব মজবুত ছিলেন। এদিকে একরোকাও খুব ছিলেন। যে কাজটী করিব বলিয়া মনে করিতেন, সেটি সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সর্ব্বস্ব পণ ছিল। তিনি কুটিলচক্রের একজন প্রধান নায়ক—অর্থনীতির একজন উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোক ছিলেন।

কনিষ্ঠ বলরামের স্বভাব আবার সকলের বিপরীত। লেখাপড়ায় তিনি বিশেষ পণ্ডিত হইয়াছিলেন বটে, তাঁহার স্বভাবচরিত্র তদনুযায়ী ছিল বটে, কিন্তু তিনি কপট না হইলেও তাঁহার বিষয়বুদ্ধি কিছুমাত্র ছিল না। দিবারাত্রি কেবল অধ্যয়ন লইয়াই থাকিতেন। সুতরাং সাংসারিক কোন বিষয়ব্যাপার তিনি অত বুঝিতেন না, কোন তত্ত্বই রাখিতেন না। অপর দুই সহোদরে যাহা করিতেন, তাহাই হইত। মধ্যম রমানাথ বাবু একাই প্রায় বিষয়-সম্পত্তির সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করিতেন। মাম্‌লা-মোকর্দ্দমায়, ফাঁদ-ফন্দীতে চালাকি-চাতুরিতে রমানাথ করের জোড়া মিলিত না। বুদ্ধি-বিবেচনা, শলা-পরামর্শ লইতে হইলে গ্রামের লোক রমানাথ করের নিকট দৌড়িয়া আসিত। গ্রামের কোন গণ্ডগোল মিটাইতে হইলে করেদের মেজ বাবুই তাহার প্রধান মধ্যস্থ হইতেন। গ্রামশুদ্ধ সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত,—ভয়ও করিত। ফল কথা, রমানাথ কর গ্রামের এক প্রকার মাথা—হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।

কালসহকারে সহোদরত্রয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মাধব করের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। মধ্যমের একমাত্র কন্যা এবং কনিষ্ঠের একটিমাত্র পুত্রসন্তান ছিল। রমানাথ করের কন্যাটির নাম বসুমতী। হরিপুরের বোসেদের বাড়ীতে তাহার বিবাহ হয়। বংশের মধ্যে একটী কন্যা, এইজন্য বসুমতীর পিতা মাতা বিবাহ দিয়া কন্যা ও জামাতাকে নিজ বাটীতেই রাখিয়াছিলেন। সুতরাং বসুমতী জীবনে কখন শ্বশুর বাড়ীর মুখ দেখিতে পায় নাই। অধিকন্তু তাহার শ্বশুরও নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন। স্বামী যদুবাবু মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিয়া পিতামাতাকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার মাতার ভাগ্যে কখন পুত্রবধুর মুখদর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার

পৌত্রের মুখ দেখিতে পাইয়া ছিলেন। এই বসুমতীর বিবাহের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করে। রমানাথ বাবুর দৌহিত্রটির নাম হরনাথ। হরনাথ যখন এক বৎসরের, তখন তাহার পিতার কাল হইল। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে যদুবাবুর মাতা একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে যদুবাবুর পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাহাতেই রমানাথ বাবু লোকজন সঙ্গে দিয়া হরনাথকে একবার হরিপুরে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু প্রাণ থাকিতে বসুমতীকে এক দণ্ডের জন্য শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইতে পারিলেন না। হরনাথের বয়স তখন প্রায় চারিপাঁচ বৎসর। তাহার পরেই বসুমতীর শাশুড়ীঠাকুরাণীর কাল হইল। সেই অবধি হরিপুরের সম্বন্ধ একেবারে উঠিয়া গেল।

কনিষ্ঠ বলরামের দুই সংসার। কেশবপুরের মধুঘোষের কন্যা জ্ঞানদা বলরামের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। জ্ঞানদা যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। কিন্তু দোষের মধ্যে জ্ঞানদার স্বভাব কিছু চঞ্চল, তবে ব্যাপিকা স্ত্রীলোকের মত নয়। জ্ঞানদা সরলতার আদর্শ, সৌন্দর্য্যের আকর। বলরাম বাবু জ্ঞানদাকে দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বিশেষতঃ জ্ঞানদা বাটির ছোট বউ, সকলের আদরের পাত্রীও ছিল। পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় জ্ঞানদা পিতার নির্ধনত্বের অপযশ ছিল। মাধব বাবু কেবল জ্ঞানদাকে পরমা সুন্দরী দেখিয়া প্রিয়তম কনিষ্ঠের সহিত এই বিবাহ সঙ্ঘটনা করেন। এদিকে ছোট বৌয়ের অত রূপ গুণ থাকিলেও সময়ে সময়ে জ্ঞানদাকে মেজ বৌয়ের মুখ হইতে "হাঘরের মেয়ে, লক্ষ্মীছাড়ার ঝী" ইত্যাদি মিষ্টি মিষ্টি বুলিগুলি শুনিতে হইত। কিন্তু তিনি সে কথায় কোন উত্তর দিতেন না। তবে যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন গোপনে বসিয়া দুই এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিতেন। ফল কথা, মেজ গিন্নী ছোট বউকে একবারে দেখিতে পারিতেন না। তাহাতে আবার জ্ঞানদা অল্পবয়সেই গর্ভবতী হইয়া ছিলেন। মেজবৌঠাকুরুণের বুক ফাটিয়া গেল। তখন বাড়ীতে আর কাহারও সন্তান নাই। কেবল অভাগীর ঝী জ্ঞানদাই অন্তঃসত্বা। একি কম দুঃখ!

কিন্তু বড় বৌয়ের মন সেরূপ নহে। ছোট বউ পোয়াতি, তিনি আহ্লাদে আটখানা। বাড়ীতে কাহারও ছেলে পিলে নাই, তবু যা হোক, ছোট বৌয়ের কোলে কিছু হইলে শ্বশুরের বংশ থাকিবে, এই আহ্লাদেই

বড় বউ একেবারে আটখানা! তিনি জ্ঞানদাকে পেটের মেয়ের মত ভাল বাসিতেন, প্রাণের অপেক্ষা যত্ন করিতেন। ভাল জিনিষটা পাইলে আগে ছোট বউকে দিতেন। কোনরূপ নূতন কাপড়, নূতন গহনা উঠিলে, তিনি আগে ছোট বৌয়ের জন্য কর্ত্তাকে ফরমাইশ করিয়া বসিতেন। কেবল মেজো গিন্নীর বুক হিংসায় ফাটিয়া যাইত। কিন্তু মুখে মেজ ঠাকরুণকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। মেজ বউটী একদিকে যেমন মিষ্টমুখ, অপর দিকে তেমনি কলহপ্রিয়। কলহে তাঁহার সহিত সকলেই পরাজিত। তিনি যখন রণমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, কলহ সংগ্রামে প্রবৃত্তা হইতেন, তখন বোধ হইত যেন স্বয়ং ভগবতী রণচামুণ্ডা-বেশে জগতে প্রলয় ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার সময়ে সময়ে তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি, অমায়িকভাব, বচনমধুরতা সন্দর্শন করিলে, বোধ হইত যেন, স্বয়ং কমলালয় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম-বধু-মূর্ত্তিতে অনন্তপুরে করদের অন্তঃপুরে বিরাজ করিতেছেন। তখন কে বলিবে যে, মেজ বৌয়ের অন্তঃকরণে কোন খলতা, কপটতা, বা হিংসাদ্বেষ আছে?—আর কে না বলিবে যে, করদের মেজ বউটী বাড়ীর লক্ষ্মী?—এমন বউ আর হইবে না? যাহারা মেজবউটীকে ভালরূপ জানিত না, তাহারাই তাঁহার গুণাবলীতে গলিয়া যাইত। আবার যাহারা তাঁহাকে বিশেষরূপ চিনিত, তাহারাও গালাগালির ভয়ে তাঁহার গুণগ্রামের যশো-গৌরব ঘোষণা না করিয়া পার পাইত না।—তাঁহার কাছে নিস্তার কাহারও ছিল না।

ছোট বউ অন্তঃসত্বা! মেজবৌয়ের রাত্রিতে ঘুম নাই—দিনে আহার নাই। মেজবউ হিংসার জ্বালায় অস্থির। কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব সহজে বুঝিবার যো ছিল না। যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই মেজ গিন্নির মনোবাসনা পূর্ণ হইবার সুবিধা হইল। ছোট বউ যখন আটমাস অন্তঃসত্বা, তখন একদিন তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল যে, তাহার মায়ের সাংঘাতিক পীড়া!—বাঁচে কিনা সন্দেহ। তাঁহার ইচ্ছা এ সময়ে মেয়েটীকে একবার দেখেন। সকল বাড়ীতেই ভাল-মন্দ লোক আছে। সকল স্থানেই সৎ-অসৎ আছে। বাড়ীর—পাড়ার সকল স্ত্রীলোকে শুনিল যে, করেদের ছোট বউয়ের মায়ের বড় কঠিন পীড়া,—বাঁচেন কিনা সন্দেহ! সেই জন্য ছোটবৌকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে লোক আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকে বাপের বাড়ী

পাঠাইতে কেহ কেহ মত করিল। কেহ কেহ বলিল, "সে কি গো? প্রায় ভরা পোয়াতি এখন কি কোথাও যেতে আস্‌তে আছে? তায় কাছে ঘর নয়; এক দিল্লির পথ! সে কেশবপুর কি এখানে গা? না, না—অমন কাজ করো না।—শূন্যে কি এখন উঠতে আছে?"—আবার কেহ কেহ কহিল, "না গিয়াই বা থাকে কেমন করে? হাজার হউক, না, দশমাস দশদিন পেটে ধরেছে, কত কষ্ট করে মানুষ করেছে, সেই মায়ের ব্যাম,—মরমর! একটীবার চোখের দেখা,—তাও দেখবে না? হ'লেই বা আটমাস পোয়াতি। বরাৎ ছাড়া ত পথ নাই। বরাতে যদি মন্দ থাকে, তাহলে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকলেও, কেউ আট্‌কে রাখতে পারবে না!—এ কি জান?—যে যত আতু পাতু করে, তারই মন্দ ঘটে।—নইলে কিছুতেই কিছু হয় না। আটমাস, নমাস, শূন্যে উঠ্‌তে নেই,—হেন করতে, তেন করতে নেই, ওসব কথার কথা! এই যে, ভট্টচায্যিদের বড় বউ, নমাস পেটে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী চলে এল। কৈ, তার কিছু হলো না?—তাঁরা ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,—ভটচায্যি-মানুষ। তাঁহারাই ত লোককে বিধেন দিয়ে বেড়ান। বলি, আমরা ত আর তাঁদের চেয়ে পণ্ডিতও নই, জ্ঞানীও নই!"

মেজ গিন্নির সুবিধা উপস্থিত, এমন সুযোগ আর হইবে না। তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, তা বই কি, ছোট বউএর একবারে যাওয়া উচিত! ঐ যে বরাত ছাড়া পথ নাই, সেই কথাই ঠিক কথা! অদৃষ্টে ভাল থাক্‌লে, কেউ মন্দ করতে পারে না। আর মন্দ হবার হলে, কেউ ধরে রাখ্‌তে পারে না!—সকলি বরাৎ বৈ ত নয়!"

বাড়ীর মধ্যে মেজগিন্নিই সর্ব্বে সর্ব্বা!—মেজগিন্নির যখন মত হইল ছোট বউকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে হইবে, তখন সে বিষয়ে আর কেহ অমত করিতে পারিল না। ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ী যাওয়া স্থির হইল। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ হইলে, ছোটবউ আপনার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলেন। ছোটবউ পাল্কীতে উঠিল! সঙ্গে আটজন চুলে বেহারা আর দুইজন পাইক চলিল। ছোটবাবু সে সময় কলিকাতায় ছিলেন। মাস পাঁচ ছয় হইল, বলরামবাবু কলিকাতার খোংরাপটীতে একখানি আড়ত খুলিয়াছিলেন। এবং সেই কারণে এক্ষণে তিনি সর্ব্বদা কলিকাতাতেই থাকিতেন। সুতরাং তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না।

অধিকন্তু ছোট বৌয়েরও পিত্রালয়ে যাইতে আন্তরিক কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কেবল মেজগিন্নির তাড়নায় ও গঞ্জনায়, তাঁহাকে অগত্যা বাপের বাড়ী যাইতে হইল।

এক সপ্তাহ পরে বেহারা ও পাইক সকলে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ছোটবউ আর আসিল না। সকলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, পথে যাইতে যাইতে ছোট বৌয়ের অকস্মাৎ কি একটা বেদনা উপস্থিত হয়। একদিন যন্ত্রণাভোগ করিয়া অবশেষে একটী মৃতসন্তান প্রসব করেন। এবং প্রসবের তিন চারি ঘণ্টা পরেই, নিজে প্রাণত্যাগ করেন। বেহারারা আর কি করিবে? যেটা সহজ বুঝিয়াছে, সেটাই করিয়াছে। তাহারা মৃতদেহ দুইটী পথের ধারে বনের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

এই সংবাদে বাড়ীর ও পাড়ার সকলেই অত্যন্ত কাতর হইল। মেজ গিন্নি ছোট বৌয়ের শোকে একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া লইলেন। বড় বৌয়ের মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। মাধব বাবু শুনিয়া, ছোটবউকে বাপের বাড়ী পাঠানর জন্য সকলকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তখন আর তিরস্কার ভৎর্সনায় কি ফল লাভ হইবে?—গৃহে চুরি হইয়া গেলে, গৃহস্থকে অসাবধানতার জন্য তিরস্কার করায় কোন ফলই নাই। পাড়ায় যাঁহারা ছোটবউকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার নিমিত্ত বিধান দিয়াছিলেন; তাঁহারা এক্ষণে বরাৎ দেখাইয়া সকলকে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু ছোটবৌয়ের জন্য অনেকের মনে বড় কষ্ট হইল। অনেকেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা! অমন লক্ষ্মী বউ আর হবে না।"

ক্রমে কলিকাতায় ছোটবাবুর নিকটে, এই দুর্ঘটনার সংবাদ আসিল। নিরীহ বলরাম কর এই নিদারুণ সংবাদে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কাজকর্ম্ম তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। তিনি কারবারের ভার নিজের প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিয়া উদাস অন্তঃকরণে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া গেলেন। এবং দশ বৎসরকাল নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণের অনেকটা শমতা হইল। যাহা হউক, তাঁহার সহোদরেরা আর তাঁহাকে প্রবাসী হইতে দিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার বিবাহ দিলেন। জমিদার এই অপরূপ আকস্মিক মৃত্যুর এক বৎসর পরে, মেজবাবুর

'বসুমতী' নামে একটী কন্যা জন্মে। যে বৎসর ছোটবাবু স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন, সেই বৎসর তাঁহার বিবাহ হইল। এবং এই বিবাহের তিন বৎসর পরেই, বসুমতীর একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে বিষয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

বসুমতীর পুত্রসন্তান জন্মিবার প্রায় পাঁচ বৎসরের ভিতর, ছোট-বাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। কিন্তু, তিনি সূতিকাঘরেই সূতিকা পীড়ায় জীবন হারাইলেন। তাহার দুই বৎসর পরে, ছোটবাবুও মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলেন। বড়গিন্নি ছোটবাবুর পুত্র কিশোরীলালকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বাটীর মধ্যে হরনাথেরই আদর অধিক। বাটীর লোকজন, চাকর-দরওয়ান হরনাথকেই অধিক যত্ন করে। না করিলে চলিবে কেন? হরনাথ যে মেজগিন্নির বসুমতীর একটিমাত্র সন্তান—"সবে ধন নীলমণি!" তাহাতে আবার বাল্যকালেই পিতৃহীন। সুতরাং, হরনাথকে লইয়াই বাড়ীশুদ্ধ সশ-ব্যস্ত। হরনাথ কাঁদিলে বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়,—দাস-দাসীগণের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। হরনাথ হাসিলে বাড়ীও হাস্যময় হইয়া উঠে। আর পিতৃমাতৃহীন কিশোরীলাল! সে দীনদুঃখী অনাথের ন্যায় দিবারাত্র কেবল একজন পরিচারিকার নিকটে পড়িয়া থাকে। তাহাকে আর কেহ ভাল করিয়া দেখে না। মেজগিন্নির ভয়ে তাহার জন্য কেহ আর বিশেষ যত্ন মমতা দেখায় না। তবে লোকলজ্জার খাতিরে মেজকর্ত্তা সময়ে সময়ে এক একবার কিশোরীলালের খোঁজ খবর লইতেন।

ক্রমে মাতামহীর যত্নে ও আদরে হরনাথ বাবু শুক্লপক্ষীয় নিশিনাথের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রমানাথ বাবুও সযত্নে দৌহিত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। হরনাথ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যাহা একবার দেখিতেন, কি একবার শুনিতেন, তাহাই তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞানায়ত্ত হইয়া যাইত। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই হরনাথ বাবু বিদ্যা বুদ্ধিতে চমৎকার হইয়া উঠিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মাতামহের গুণরাশিরও অধিকারী হইয়া বসিলেন। অনন্তর রমানাথ বাবু হরনাথকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করাইয়া জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্ম্ম বিশেষরূপে শিখাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ-

বুদ্ধি হরনাথ বাবুও অত্যল্প দিনের মধ্যে বিষয় বুদ্ধিতে পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মাতামহের মৃত্যু হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মাধব বাবুরও ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। হরনাথবাবু এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উঠিলেন। সুতরাং তিনিই করেদের সমগ্র বিষয়সম্পত্তির অভিভাবক—প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। নাবালক কিশোরীলাল উপযুক্ত ভাগ্নেয়ের অধীনে থাকিয়া বিদ্যাপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কিশোরীলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তদসঙ্গে পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাতের সমস্ত সদ্‌গুণও প্রাপ্ত হইলেন। হরনাথ বাবু স্বীয় মাতামহের ন্যায় উদ্ধত, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, স্বার্থপর ও অত্যন্ত মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কিশোরীলাল সত্যপ্রিয়, সদালাপী, পরোপকারী, নিরহঙ্কার ও একান্ত সরল-চিত্ত ছিলেন। হরনাথের, যে রূপেই হউক স্বার্থসাধন হইলেই, মহাসন্তোষ হইত। কিন্তু কিশোরীলাল কোনরূপে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরোপকার সাধন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন,। হরনাথ বাবু অকারণে শত শত মিথ্যা কথা কহিতেন। কিশোরীলাল নিজের সমূহ ক্ষতি হইলেও সহজে একটি মিথ্যা কথা ব্যবহার করিতেন না। এক কথায়, দুইজনের হৃদয় দুই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত। দুইজনের প্রবৃত্তি দুই ভিন্ন পথের অনুসারিণী।—কিশোরীলাল সত্যের কিঙ্কর হরনাথ সত্যপথের কণ্টক!—কিশোরীলাল ধর্ম্মের অনুচর, হরনাথ অধর্ম্মের সহচর!

কিশোরীলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও, বয়ঃকনিষ্ঠতাপ্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে ভাগিনেয় হরনাথেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। হরনাথই বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। জমিদারী-কাগজপত্র দেখিতেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রাখিতেন। কিশোরীলাল কিছুই দেখিতেন না,—কিছুই করিতেন না। হরনাথ যাহা করিতেন, তাহাই হইত।—কিশোরীলাল তাহাতে কোন দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করিতেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় বড়বাজারে কিশোরীলালের পিতার একখানি আড়ত ছিল। কিন্তু বলরামবাবুর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে, সে আড়তদারী কাজ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কিশোরীলালের এক্ষণে ইচ্ছা হইল যে, কলিকাতায় থাকিয়া তিনি আবার সেইরূপ আড়তদারী

কাজকর্ম্ম করেন। হরনাথ বাবুকে তিনি এ বিষয় জানাইলেন। হরনাথ শুনিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বেশ ত! আমি এখানে থাকিয়া জমিদারী বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধারণ করি। তুমিও কলিকাতায় থাকিয়া তোমার পৈতৃক ব্যবসা চালাও। তাহাতে লাভ ভিন্ন ত আর ক্ষতি নাই! তুমি কলিকাতায় থাকিয়া কাজকর্ম্ম চালাইবে; মধ্যে মধ্যে টাকার প্রয়োজন হইলে, আমাকে পত্র লিখিলেই টাকা পাঠাইয়া দিব। এ অতি উত্তম কল্পনা করিয়াছ।"

কিশোরীলাল ভাগিনেয় হরনাথ, এবং অপরাপর বন্ধুজনের সম্মতি লইয়া, তাঁহার পিতার পুরাতন আড়তঘরেই একটি আড়ত খুলিয়া বসিলেন। ক্রমে কাঞ্চনপুর-নিবাসী দুইজন সম্ভ্রান্ত ধনীব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সহিত কারবারে যোগ দিলেন! চারি পাঁচ বৎসর ক্রমাগত তাঁহাদের কারবার বেশ চলিল,—বেশ লাভও হইতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে কারবারে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। একবার তাঁহার ঘরের কতকগুলি মাল চোরাই বলিয়া প্রমাণ করায়, রাজদ্বারে তাঁহার বিস্তর অর্থদণ্ড হইল। আর একবার, অন্য এক কারণে, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস হইল। সুতরাং বাজারে তাঁহার মানসম্ভ্রম ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার আড়তের কতকগুলি হুণ্ডি জাল বলিয়া ধরা পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে থানাতল্লাসীতে, তাঁহার গদি হইতে একবাক্স মেকিটাকাও বাহির হইয়া পড়িল। মহাহুলুস্থুল—মহাবিভ্রাট বাধিয়া উঠিল! চারিদিগে হৈ হৈ, রৈ রৈ, শব্দ পড়িয়া গেল! কিশোরীলাল লজ্জা ও মানের দায়ে ইতিপূর্ব্বেই গাঢাকা দিয়াছিলেন। সুতরাং পুলিশ হইতে তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল! যাহাদের হুণ্ডি জাল হইাছিল, তাহারা কিশোরীলালের নাম, ধাম, আকৃতি প্রভৃতি ছাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে ধৃতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিল। দেশ-বিদেশে গোয়েন্দা ঘুরিতে লাগিল।—চতুর্দ্দিকে ঢিঢিকার পড়িয়া গেল।—কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে একটী বড় দরের মোকর্দ্দমা রুজু হইল।

কিশোরীলালের অপর দুইজন অংশীদার, এই জালহুণ্ডি আর মেকিটাকা ধরা পড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত অংশনামায় ইস্তাফা দিয়া, তাঁহাদের স্ব স্ব মূলধন উঠাইয়া লইয়াছিলেন। আর সমস্ত কারবারের

খাতাপত্র কিশোরীলালের নামেতেই চলিত, সুতরাং ফৌজদারির সমস্ত ঝোঁকই একা কিশোরীলালের ঘাড়েতেই চাপিল। পাওনাদারেরা নালিশ করিয়া তাঁহার নামে এক তরফা ডিক্রি করিয়া লইল। দেনার দায়ে কিশোরীলালের বিষয়ের অংশ নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। চতুর হরনাথ বেনামিতে সেই সকল সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইলেন।

এদিকে হরনাথ বাবু দেশে রটাইয়া দিলেন যে, লজ্জা ও মানের ভয়ে কিশোরীলাল জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।—তিনি জীবিত নাই।

সোমেশ্বরপুরে ঘোষেদের বাড়ী কিশোরীলালের বিবাহ। স্মরদেব বাবুর মাতার ভগ্নী সুরতবালার মামাশ্বশুরের মেয়েকে ইনি বিবাহ করেন। কিশোরীলালের স্ত্রীর নাম শশিবালা। শশিবালা স্বামীর এই প্রকার অভাবনীয় ঘটনার বিষয় প্রথমে কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। কিশোরীলাল নিরুদ্দেশ হইলেন, হরনাথবাবুও শশিবালাকে তাহার পিত্রালয় হইতে অনন্তপুরে লইয়া আসিলেন। হরনাথের কথামত বাড়ীতে সকলেই জানিয়াছিল যে, কিশোরীলালের অপঘাত মৃত্যুই ঘটিয়াছে। শশিবালাও জানিল যে, সে এক্ষণে বিধবা হইয়াছে। কিন্তু বিধবা হইয়াছে শুনিয়াও, সে বিধবার বেশ ধরিল না।—বিধবার আচরণ কিছুই করিল না। মাছ ভাত খাইত, শাড়ী পরিত, সিঁথিতে সিঁদুর দিত। বালিকা বলিয়া, কেহ তাহাকে কোনও কথাটী বলিত না,—সকলেই উপেক্ষা করিত! কিশোরীলালের জননী ছিল না। মাধববাবুর স্ত্রী তাহাকে শৈশবকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুতরাং কিশোরীলালের শোক তাঁহাকেই অধিক লাগিল।

করেদের সংসারে এক্ষণে রহিল কে?—বড়বাবুর স্ত্রী, মেজবাবুর স্ত্রী, বসুমতী, শশিবালা আর হরনাথ বাবু। ইনিই মেজবাবুর দৌহিত্র, বসুমতীর একমাত্র পুত্র, করগোষ্ঠীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হরনাথ বসু। ইনিই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাঁরই এখন রামরাজত্ব।—করগোষ্ঠী এখন নির্ব্বংশ প্রায়। অত বড় বংশটার নাম লোপ প্রায় সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এখন দৌহিত্র সন্তানে অর্শিল।

হাকিম সাহেব।

গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঝুর ঝুর করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জলে কুমুদিনী নাচিতেছে। স্থলে মল্লিকা হাসিতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদকে চারিধারে ঘেরিয়া, তারাগণ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে। শূন্যপথে ডাকিতে ডাকিতে পাপিয়া উড়িতেছে। গাছের উপরে কোকিল গাইতেছে। পেচকেরা সময় পাইয়া বাহির হইতেছে। অদূরে আশেপাশে, ঝিল্লিবধূগণ ঝিঁ-ঝিঁ-রবে জগৎ মাতাইয়া তুলিতেছে। এদিকে দামোদরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি পবনদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে, হেলিতে দুলিতে, নাগরের উদ্দেশে চলিয়াছে। নদীর জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে! জল কাঁপিতেছে, কখন উঠিতেছে, কখন নামিতেছে, কখন স্থির হইয়া থাকিতেছে। সেই সঙ্গে চন্দ্রের প্রতিবিম্বটীও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইতেছে। বোধ হইতেছে, কে যেন খানিক স্বর্ণখণ্ড লইয়া মনের সুখে আমোদভরে, ছিনি-মিনি খেলাইতেছে। আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার রাত্রি। এমন মনোহর সন্ধ্যা সময়ে, করেদের সেই প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে, ত্রিংশৎবর্ষীয় একজন পরম-সুন্দর যুবা, সুচারু শয্যায় শয়ন করিয়া মলয়াচলপ্রবাহিত, সুশীতল মন্দসিগ্ধ সমীরণ-সেবন-সুখ-সম্ভোগ করিতেছেন। ঘরটী বেশ সাজান,—দিব্য মানান-সই সাজান।—ছবি, দেয়ালগিরি, আয়না, আলমারি, কোচ, কোদারা, টেবিল, ফুলদান, আতরদান, গোলাপপাস —যেখানকার যেটী, সেটী সেই স্থানে সুন্দররূপে সাজান। গোলাপ আতর, অডিকলম, লেভেণ্ডারের সৌগন্ধে ঘরটী সুবাসিত। আবার, দেওয়ালে চারিধারে নানাবিধ পুষ্পলতায় সুচারু-রূপে চিত্রিত, মেজেটী একখানি সুন্দর কারপেটে মোড়া। এদিকে আয়তনেও ঘরটী দিব্য মানানসই।—যেমন দীর্ঘ, তদনুযায়ী প্রশস্ত। উত্তর দক্ষিণে আটটী করিয়া ষোলটী জানালা। দক্ষিণদিকের জানালাগুলি সমস্তই খোলা। জানালার সারসীগুলি পর্য্যন্ত খোলা। দক্ষিণদিকের জানালার নীচেই, বাটীর অন্তঃপুর-পশ্চাৎস্থিত পুষ্পকানন। যুবকটী গৃহের পূর্ব্বদিকস্থিত গজদন্ত-নির্ম্মিত একখানি পালঙ্কে,

শ্রিঙ্গের গদীতে শয়ন করিয়া আছেন। দেওয়ালগিরিতে বাতি জ্বলিতেছে। যুবার শীর্ষদেশস্থ উন্মুক্ত-বাতায়ন-পথে, সুমন্দ গন্ধবহ অবাধে প্রবেশ করিয়া, যুবকের পরিধেয়বসন, মস্তকের কেশ পাশ অল্পে অল্পে কাঁপাইয়া দিতেছে। যুবকের সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। তিনি নয়নযুগল ঈষৎ নিমীলন করিয়া কি প্রগাঢ় চিন্তায় অভিভূত!

নিশা প্রহর প্রায় অতীত। আমাদিগের যুবকটী তদবস্থভাবেই অবস্থিত। কি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! যুবকের অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রদ্বয় একেবারে নিস্পন্দ—নিনিমেষ। গৃহটী নির্জ্জন—নিস্তব্ধ। কক্ষের উত্তর দিকের একটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একজন সুকেশা বিধবা স্ত্রীলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকের বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশৎ অতীত। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গঠন বেশ দোহারা, মানানসই। বেশী দীর্ঘও নয়, বেশী খর্ব্বও নয়—মাঝামাঝি। মুখের আকৃতিটুকু বড়ই হৃদয়াকর্ষক। নাসিকা, চক্ষু, ওষ্ঠাধর, কর্ণ, ভ্রূ, ললাট সকলগুলিই সুঠামে সুসৌষ্ঠব। বিধবা হইয়াছে, বয়সও হইয়াছে, তথাপি যৌবনশ্রী অপসৃত হয় নাই, এখনও লাবণ্য দীপ্তিমান! যুবতীসুলভ হাবভাব, সতৃষ্ণকটাক্ষ, এই রমণীর আকর্ণ বিস্ফারিত নয়নযুগলে খেলিতেছে ও খেলাইতেছে।

রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারদেশের নিকট হইতে, স্নেহার্দ্রস্বরে ডাকিলেন, "হরনাথ!—"

পাঠক এইবার বুঝিতে পারিয়াছেন,—এই যুবকটীর নাম হরনাথ! ইনিই করবংশীয়া বসুমতীর গর্ভে সমুদ্ভূত হরনাথ বসু নামে অভিহিত। ইনিই অনন্তপুরের করেদের একমাত্র উত্তরাধিকারী, রমানাথ করের অতি যত্নের, অতি আদরের দৌহিত্র হরনাথ বসু।

রমণী আবার ডাকিলেন,—"হরনাথ!"

কিন্তু হরনাথের সংজ্ঞা নাই। তাঁহার মতিগতি, স্মৃতি শ্রুতি এক্ষণ চিন্তার অনন্তস্রোতে নিমগ্ন—একেবারে আচ্ছন্ন। সুতরাং রমণীর বাক্য তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল না।

রমণী পুনশ্চ ডাকিলেন, "হরনাথ!—হরনাথ, ঘুমাচ্চ কি?"

এবারও না। এবারও হরনাথের চৈতন্য নাই, চমকভাবও নাই।—হরনাথ তদবস্থভাবেই আছেন। তখন রমণী ধীরে ধীরে শয্যার নিকটস্থ হইয়া হরনাথ বাবুর মস্তক স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন,—"হর!—ঘুমাচ্চ?"

এইবার বাবুর চেতনা সঞ্চার হইল। চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, শিরোদেশে তাঁহার জননী। এই রমণীই রমানাথ করের একমাত্র কন্যা—বসুমতী।

হরনাথ জননীকে নিকটে দেখিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"কি মা, কেন মা?"

বসুমতী মস্তকে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন, "কেমন আছ বাবা?"

হর।—ভাল নয় মা—বড় অসুখ।

বসু।—ঘুম হয়েছিল কি?

হর।—কই! এই সবেমাত্র তন্দ্রা আস্‌ছিল, আর তুমি এসে ডাক্‌লে।

বসু।—আমি এখন ডাক্‌তাম না। হাকিম সাহেব এসেছেন তাই।

হর।—তিনি কোথায়?

বসু।—তিনি বরদাকে দেখে আস্‌ছেন।

হর।—তবে তুমি ওঘরে যাও।

বসুমতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরনাথ বাবু আবার একাকী পড়িলেন। বাবুর অসুখ হইয়াছে।—শীরঃপীড়া। বড় লোকের বড় কথা। গরিবের মাথাটা ভাঙ্গিয়া গেলেও, তার অসুখ নয়। কাঙ্গালের সান্নিপাতিক বিকার হইলেও, তাহাকে দেখিবার লোক নাই। কিন্তু ধনবানের সামান্য ঘামাচি হইলে ডাক্তার চাই। একটু রগ ধরিলে দশসের বরফ চাই। আট দশ বোতল গোলাপ জল চাই। বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। বাবুর অসুখ! মহামারী কাণ্ড। বাড়ীশুদ্ধ শশব্যস্ত। হাকিমের উপর হাকিম—ডাক্তারের উপর ডাক্তার! ঔষধের ছড়াছড়ি, বন্ধু বান্ধবের হুড়াহুড়ি! শতজনে ব্যতিব্যস্ত।

আজ করেদের একমাত্র বংশধর বড় আদরের—বড় কষ্টের ধন হরনাথ বাবুর অসুখ। বাড়ীশুদ্ধ সকলের ভাবনা,—সকলের অসুখ।—কি হইবে! ছেলে কিসে ভাল হইবে!—এই ভাবনায়, বসুমতীর দিনে আহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই।

বরদা, বসুমতীর মাসতুতা ভাগিনী, হরনাথের মাসী। বরদা বোনপোর ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া, নিজেও শয্যাগত হইয়াছেন। মেজগিন্নী দৌহিত্রের আরোগ্য কামনায় সত্য-নারায়ণের শিন্নি মানিয়াছেন। বড়গিন্নি

আর শশিবালার চিরকালই সমভাব। কিশোরীলালের সেই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা শুনিয়া অবধি, তাঁহাদের সকল সুখের অবসান হইয়াছে। তাঁহাদের সম্পদেও অসুখ, বিপদেও অসুখ; সুখেও অসুখ, দুঃখেও অসুখ। বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাদের হৃদয়ের সুখের মূল একেবারে উন্মূলিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আর সুখ কোথা, এ কিরূপেই বা হইবে? তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয় এখন বিষাদের অনন্তস্রোতে ভাসমান—আন্দোলিত। বিশেষতঃ শশিবালার মনের সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু বিরাজমোহিনী—হরনাথের স্ত্রী বিরাজমোহিনী দিব্য হাসিতেছে, দিব্য গল্প করিতেছে, দিব্য স্ফূর্ত্তিতে আছে! স্বামীর অসুখে বাড়ীর সকলেই অসুখী। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, সহিস-কোচ্‌ম্যান, ঘোড়া-গরু, কুকুর-বিড়াল সকলেই অসুখী.—সকলেই কাতর। কেবল বিরাজের মনে কোন অসুখ নাই, উদ্বেগের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না। এর কারণ ত কখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে না পারায়, বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে কক্ষের পশ্চিমদিকের একটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকার, কিছু কৃশাঙ্গ একটী বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাঠকবর্গ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইনিই আমাদের হাকিম সাহেব।—হাকিম সাহেব যদিও পাতলা ছিপ্ ছিপে একহারা বটেন, তথাপি একহারার উপর তাঁহার বেশ অঙ্গশ্রী আছে। ভাসা ভাসা চক্ষু দুটি খুব টানা। নাকটি টিকাল। চুল মিশকাল, কোঁকড়ান, কোঁকড়ান, তার উপর সিঁতিকাটা। মুখ সদাই হাসি হাসি। চক্ষের জ্যোতিতে সর্ব্বদাই মনের গভীরতাভাব প্রকাশ করিতেছে। হাকিমের পরিধানে একখানি মিহি কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে একটী ফিনফিনে পিরান, একখানি শান্তিপুরে উড়ানি কাঁধে ঝোলান। হাতে একগাছি গজদন্তমণ্ডিত ছড়ি, পায়ে সৌখিন চটি। বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চবিংশ হইবে। হাকিম সাহেবকে দেখিয়া একজন বিশেষ রসিক, ধূর্ত্ত ও চতুর বলিয়া প্রতীত হয়। নাম রঘুরাম সা। জাতিতে হিন্দুস্থানি বৈশ্য। জন্মস্থান আরা। কিন্তু চিকিৎসা উপলক্ষে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা, বর্দ্ধমান, হুগলি, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা সহরে বাস করিয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা হইতে অনন্তপুরে আসিয়াছেন। হরনাথ বাবুর সহিত অত্যন্ত প্রণয়। ইতি পূর্ব্বে, তিনি এই অনন্তপুরে পাঁচ বৎসর কাল

কাটাইয়া গিয়াছেন। ইনি করেদের বাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসক। তাহার বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট একটী বাটী আছে। এত দিন কলিকাতায় ছিলেন। হরনাথ বাবুর পীড়ার কথা শুনিয়া কলিকাতা হইতে প্রায় তিনমাস কাল অনন্তপুরে আসিয়া রহিয়াছেন। প্রতিদিন দুই বেলা আসিয়া হরনাথ বাবুকে দেখেন। তাঁহার মাগীর শিরঃপীড়া, তাঁহাকেও দেখিতেছেন। তবে মধ্যে দুইদিন মাত্র রোগী দেখিতে হাকিম সাহেব বর্দ্ধমানে চলিয়া গিয়াছিলেন। অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাসা বাটী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে করেদের বাড়ীতে আসিলেন। আসিয়া, হরনাথ বাবুর শয্যায় উপবেশন করিলেন। হরনাথ বাবু হাকিম সাহেবকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আছেন কেমন?"

হর।—একই প্রকার!—মন ত কিছুতেই সুস্থির হয় না।—আপনি কখন ফিরলেন?

হা।—অতি অল্পক্ষণ হইল।

হর।—এদিকের কি হল?—ওষুধপত্র কিছু যোগাড় কত্তে পারলেন?

হা।—এক প্রকার স্থির হয়েছে।

হর।—কি কর্‌বেন?

হা।—আপনার হাওয়া পরিবর্ত্তন করাই যুক্তিসিদ্ধ।

হর।—কোথা যেতে হবে?

হা।—প্রথমে কলিকাতায়, তারপর কাশী-পর্য্যন্ত।—মাকে বলেছেন কি?

হর।—এখনও বলা হয় নাই, যাবার সময় বলিয়া যাইব।

অনন্তর হাকিম সাহেব হরনাথ বাবুর কাণেকাণে কি কহিলেন। হরনাথ বাবু হাকিম সাহেবের কথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে কি ভাবিলেন. পরে বলিলেন, "মন্দ নয়।"

এই দুটী কথা বলিবার সময়, তাঁহার অধর-প্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। রোগীর হাস্যাস্য দেখিয়া সুচতুর চিকিৎসক একমাত্রা হাসি চড়াইয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে কহিলেন, "এই এর নাম হাকিমি করা!—বুঝলেন?"

হরনাথ বাবু এইবার একগ্রাম সুর চড়াইয়া দিলেন। এইবার তিনি পূরা এক গাল হাসিয়া বলিলেন,—"গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ!" "জহরী জহর চেনে, চাষায় হাল গরু চেনে!—আপনার মর্ম্ম আমিই

জানি। আপনি যে কত বড় লোক, কত উচুদরের লোক, অন্যে তা কি জান্‌বে? বিদ্যাবুদ্ধি, মানসম্ভ্রম, ধনসম্পত্তি সকল বিষয়েই আপনি বড়। এ জগতে আপনার মত লোক কয় জন পাওয়া যায়? আপনার গুণ, আপনার ভালবাসা, আমি মরিলেও ভুলিতে পারিব না।"

হাকিম সাহেব আত্ম-প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া নম্রভাবে কহিলেন, "আপনার বাড়িশুদ্ধ সকলেই আমাকে ভালবাসেন চিরকালই অনুগ্রহ করেন। তাই আমাকে অত ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। সে কেবল আপনারই গুণে। রমানাথ বাবু আমাকে ছোট ভায়ের মত দেখিতেন। আপনার মাতামহকুলের মধ্যে মানুষ ছিলেন তিনি। অত বড় লোক আর জন্মাবে না। আমি আরা হইতে যখন সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা করিবার জন্য, বিদেশে বহির্গত হই, তখন সর্ব্বাগ্রেই অনন্তপুরে আসি। এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আপনার মাতামহীর চিকিৎসা করি। শিরঃপীড়ায় তিনি বহুদিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ, "থোতামুখ ভোতা" করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মুষ্টিযোগ, টোটকা টাকা, বৈদ্যনাথে হত্যা দেওয়া, ঝাড়ান্ ঝোড়ান্ পর্য্যন্ত কিছুই আর বাকি ছিল না। অবশেষে আমি আসিলাম। কেবল একটি মাস চিকিৎসা করিলাম। একেবারে নির্দ্দোষ! সব আরাম! ব্যারামের আর লেশমাত্র ছিল না। আপনার মাতামহীর অত বড় কঠিন শিরঃপীড়া এক মাসের মধ্যে আরাম। বড় সোজা কথা নয়। সকলে বলেছিল, "শিবের অসাধ্য রোগ, কিছুতেই ভাল হইবে না!" "মাথার ঘি শুকিয়ে গেছে, মাথার ঘি শুকিয়ে গেছে, মাথার ভিতর বড় বড় পোকা হয়েছে" যাহার যাহা মনে উদয় হইয়াছে, সে তাহাই বলিয়াছে। কিন্তু মাসেক কালের মধ্যেই সে সব ভাল করিয়া দিলাম। তাহা হইতেই, আপনার মাতামহের আমার প্রতি খুব বিশ্বাস, সুতরাং খুব আদর, খুব যত্ন ও প্রতিপত্তির উৎপত্তি হইল, এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার পর বৎসরে, আপনার মা ঠাকরুণকে যে করিয়া ভাল করি, তাহা আমিই জানি। তিনি ত একেবারে শয্যাগত হইয়া ছিলেন। তাঁহার আর আশা ভরসা ছিল কি? তাহার পর, এখানে কয় বৎসর ছিলাম না। আবার এই আসিয়াছি। আপনাদের আশ্রয় ছাড়িয়া এক পাও, কোথাও নড়িতে আমার ইচ্ছা হয় না।

তবে কি না—"কর্ম্মণো পুরুষোদাসঃ" বিশেষতঃ আমাদের কাজ পাঁচজন লইয়া! পাঁচটা দেশের পাঁচটা বড় লোক বিশেষ ভালবাসেন। যিনি যখন যেখানে ডাকেন, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ যাইতে হয়। আর আমার উপর একেবারে সব ধ্রুব বিশ্বাস, শ্রদ্ধাও আছে বিলক্ষণ; সুতরাং তাঁদের খাতির এড়াইতে পারি না। তবে কি আর আপনাদের মত? আমাকে ভিন্ন আপনারা আর কাহাকেও চেনেন না; আমিও আপনাদের খুবই অনুগত এবং অনুরক্ত জানিবেন। এই এবার, সে রাজবাটীতে একাদিক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মহারাজা কোনক্রমে আমাকে ছাড়তে চান না। তার পর রায়ের কাটীর রাজাদের বাড়ী হইতে যাইবার সংবাদ আসাতে, বরিশাল যাই। তার পর বাখরগঞ্জ, চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বেড়াইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতায় ক্রমাগত চার পাঁচ বৎসর কাটাইয়া, আবার এখানে আপনাদের চির ও প্রিয় আশ্রয়ে আসিলাম। এই কয় মাসে আপনার সঙ্গে যে আমার কি প্রকার আনুরক্তি ঘটিয়া উঠিয়াছে, আপনি যে আমায় কি চক্ষে দেখিয়াছেন, আর আপনাতে যে কি মোহমন্ত্র আছে, তাহা আমি একমুখে বলিতে পারি না।—আমি যে কি—"

হরনাথ বাবু এইবার হাকিম সাহেবের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আর একটা বিশেষ পরামর্শ আছে। কিন্তু আজ আমার শরীরটা আবার একটু খারাপ বোধ হচ্চে। আচ্ছা, কাল আপনি কখন আস্‌ছেন?"

বস্তুতঃ, হাকিমের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় হরনাথ বাবু আন্তরিক কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। কাজের লোক কখন বেশী কথা—বাজে কথা ভালবাসেন না—কিন্তু আমাদের হাকিম সাহেব একজন চূড়ান্ত কাজের লোক হইয়াও, সময়ে সময়ে যখন আত্মশ্লাঘাটুকুতে রং ফলাইবার আবশ্যক হইত, তখন একবার অনন্তদেবের মূর্ত্তি ধরিতেন।

হরনাথ বাবুর কথায় হাকিম সাহেব অমনি আরব্ধ বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শশব্যস্তে বলিলেন, "যখনই অনুমতি করিবেন, তখনই আসিতে পারি।"

হর।—তবে মধ্যাহ্নে আহারাদির পর।

হা।—সে বেশ কথা, অতি উত্তম সময়। সে সময়, আমারও অবসর হবে। তবে এক্ষণে উঠ্‌লেম। আবার যাবার সময় বাটীর ভিতর হ'তে জল খেয়ে যেতে হবে।

এই বলিয়া হাকিম সাহেব তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরনাথ বাবু পুনর্ব্বার শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায়, তাঁহার শিরঃপীড়ার আর প্রাবল্য নাই। হাকিম সাহেবের সহিত সাক্ষাল্লাভের পর হইতে, তাঁহার কায় ও মন অনেক সুস্থ হইয়াছে। সুতরাং, তাঁহার হৃদয়ে এক্ষণে গভীর চিন্তারও আর তাদৃশ গুরুভার নাই। হাকিমের প্রস্থানের পর হরনাথবাবু আর অর্দ্ধ ঘটিকাকাল জাগ্রত থাকিয়া, সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে ক্রমে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে বিরাম ও আরাম লাভ করিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া, পবনদেব স্নিগ্ধতা ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধমুদিত পদ্মিনীকে কাঁপাইয়া, চাঁদমুখী নলিনীকে হাসাইয়া, মল্লিকাদি কুসুম-মণিদের সৌরভ লুটিয়া, কত নারীর বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়া, এবং নদী দীর্ঘিকাদির বক্ষ মৃদু মৃদু নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক, জগৎকে সঞ্জীবিত করিতে লাগিলেন। দেখাদেখি, নিশাকরও দিবাকরের জ্যোতি হরণ পূর্ব্বক, কাহাকেও বা হাসাইতে, কাহাকেও বা কাঁদাইতে, অর্দ্ধাঙ্গে মস্তকোপরি দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সে জ্যোতি নিজের কাছে রাখিয়া নিজে উপভোগ করিতেছেন, এখনও বাহির হইতে দেন নাই।

লতামণ্ডপ—বিশ্রাম্ভালাপ।

বেলা অবসান,—সন্ধ্যার প্রাক্কাল। সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস বিশ্বনিয়ন্তার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সাধনপূর্ব্বক অবসন্নভাবে পশ্চিমাচলাভিমুখে গিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। প্রকৃতিদেবী রক্তবস্ত্রে মস্তকাচ্ছাদন করিলেন। বিহঙ্গমকুল ব্যাকুল হইয়া কুলায়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই রমণীয় সন্ধ্যাগমে, করেদের সুরম্যোদ্যানের মধ্যস্থিত একটী লতামণ্ডপে দুইজন ব্যক্তি শিলাতলে উপবেশন করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এই দুইজন ব্যক্তিই দেখিলাম, বিশেষ পরিচিত। একজনআমাদিগের "হরনাথ বাবু।" অন্যজন ইহাঁদের সুদক্ষ চিকিৎসক "হাকিম সাহেব।"

হাকিম সাহেব তাঁহার পূর্ব্বকথিত বাক্যের ধুয়া টানিয়া কহিলেন, "তার জন্য চিন্তা কি? মশা মার্‌তে কি আর কামান পাত্‌তে হয়?"

হরনাথ বাবু।—আপনি বুঝ্‌ছেন না। লোকটা বড় চালাক, বড় ধড়ী-বাজ। আপনি ঠিক জান্‌বেন, যখন আমার সঙ্গে লেগেছেন, তখন আর তাঁকে আমি অল্পে ছাড়্‌বো না—এ আর মিত্রদের বিষয় ফাঁকি দিয়ে লওয়া নয়। তিনি কত বড় স্মরদেব, তা এই বার দেখা যাবে।

হাকিম সাহেব।—(মৃদু হাস্যে) দেবাদিদেব মহাদেবের নিকটে মদনের চাতুরীজাল আর কতক্ষণ খাট্‌তে পারে?—শিবের এক দৃষ্টিতে মদন ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন ত।

হর।—এও তাই হবে।

হা।—আর আপনিও তা হোলে স্মরহর হবেন।

হর।—আর শশিভূৎ হ'তে পারবো না?

হা।—কে বলে পার্‌বেন না?—আপনি যেরূপ মতলব এটেছেন, এর কোনটা নিষ্ফল হবার নয়।

হর।—তা হলে, আপনি এই দণ্ডেই কাঞ্চনপুরে যাত্রা কচ্চেন?

হা।—তা আর একবার ক'রে বল্‌তে? সকল প্রস্তুত।

হর।—কিন্তু মধু সর্দ্দারকে যেরূপে পারেন, হস্তগত ক'রে লবেন; আর উমাচরণ ত আপনার সঙ্গেই থাক্‌বে।

হা।—সে যা যা করতে হয়, তা আমি সমস্ত গুছিয়ে নেব। আমার কাছে কিছুই আটকাবে না তবে, এক্ষণে এদিগের—

হর।—তার জন্য চিন্তা কি? এই উপস্থিত, আপনাকে দুহাজার টাকার নোট দিতেছি। তার পর যেমন আবশ্যক হবে সেইমত দেওয়া যাবে।

এই বলিয়া, হরনাথ বাবু কামিজের পকেট হইতে কতকগুলি নোট বাহির করিয়া, হাকিম সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। হাকিম হৃষ্টচিত্তে সেই সমস্তগুলি নিজ পকেটস্থ করিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—"এখন এই হলেই যথেষ্ট হবে। আপনি আমাদের কল্পতরু বিশেষ। আপনার মতন লোক না পেলে কি আমাদের চলে?"

হর।—সে যাই হোক, এখন এখানে আর না। জানবেন, বাতাসেরও কাণ আছে।

এই বলিয়া হরনাথ বাবু শিলাতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। হাকিম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনন্তর দুইজনে কথা কহিতে কহিতে, সেই লতা-মণ্ডপের পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ধীরে ধীরে দামোদরতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় উভয়ে সার্দ্ধ ঘটিকাকাল কথা-বার্ত্তা কহিয়া, হরনাথ বাবু, সেই দ্বার দিয়া, অবাস্তের পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক, দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া, অন্তঃপুরমধ্যে চলিয়া গেলেন। হাকিম সাহেব নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, একখানি তরনী আরোহণ করিলেন।

হরনাথ বাবু যখন দামোদর তটে যান, তখন তাঁহার পকেট হইতে, এক তাড়া কাগজ পথিমধ্যে পড়িয়া যায়; তাহা তিনি কিছুই টের পান নাই।

সেই লতামণ্ডপের অন্তরাল দেশে থাকিয়া, অপর একজন ব্যক্তি গোপনে, এতক্ষণ তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। কিন্তু হাকিম সাহেব কিম্বা হরনাথ বাবু তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। যখন কাগজের তাড়াটা পড়িয়া যায়, তাহা সে দেখিতে পায়। এবং যেমন হরনাথ বাবু অন্যমনস্ক ভাবে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিলেন, অমনি সেই ব্যক্তি অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া, কাগজের তাড়াটী তুলিয়া লইয়া, পবনবেগে কোথায় অন্তর্হিত হইল, আর নয়নগোচর হইল না। লোকটীর আপাদমস্তক কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ আবৃত। সুতরাং, তাহাকে সহজে চিনিবারও উপায় ছিল না

সতর্কতা।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে স্মরদেব বাবু মিত্রদিগের প্রসিদ্ধ বৈঠকখানায় বসিয়া আমলাবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন কহিতেছিল, হরনাথ বাবুর সহিত বাদবিসম্বাদ করায় আপনার কোন ফল নাই। তাহাতে বরং সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমার বিবেচনায়, ও সংস্রব আপনি ছাড়িয়া দিন।"

স্মরদেব বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বল কি, রামদয়াল! চোকের উপর এত অত্যাচার কি সহ্য হয়?—উনি কি একলাই বড় লোক? ওঁরই পয়সা

আছে? আর কারও নাই? একজন নিরীহ ভদ্রলোক—তার উপর এত অত্যাচার।" সাধুচরণ দে যথার্থই সাধুলোক। আর তার জমীজারাৎ যে সমস্তই নিষ্কর, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তার জমি অকারণে মালের জমি ব'লে হরনাথ বাজেয়াপ্ত ক'রে নিতে চায়। মনে কর, তোমার এই দশ বিঘা লাখেরাজ জমি আমি যদি জোর ক'রে দখল ক'রে বসি, তা হলে তোমার মনটা কি রকম হয়? আর লোকেই বা আমাকে কি বলে?"

আমলাটীর নাম রামদয়াল সরকার।—জাতিতে কায়স্থ। বড় ভদ্রলোক। স্মরদেব বাবুর কথায় রামদয়াল মস্তক নত করিয়া কহিল. আজ্ঞা হাঁ, তা বটে। তবে পরের কথায় থাকিলে, নিজের বিপদ হইবার সম্ভাবনা। তাই আমি আপনাকে বারণ করছিলাম।"

স্মর।—কি জান. সরকার মহাশয়! প্রাণপণে পরোপকার করাই মানুষের ধর্ম্ম! যখন এই উপস্থিত অত্যাচারটী দমন করিবার আমার ক্ষমতা আছে, তখন কেন তার প্রতিকার না করি? তবে বিপদের কথা যে বল, তা সংসারে বাস করিতে হইলেই বিপদ সম্পদ, সুখ দুঃখ সকলই ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রীয় বচন দেখ না কেন——"শরীরং ক্ষণভঙ্গুরং—পরার্থে বিসৃজেৎ সর্দা।" অথবা বলে—"পরের হিত করিতে গেলে, পড়তে হয় কত বিঘ্ন জালে।"

আর একটী কথা কি জান. বিপদ না হলে সম্পদের গৌরব হয় না। দুঃখ না থাকলে, সুখের আদর হয় না। যা হোক, কাল প্রাতঃকালেই আমি কাঞ্চনপুরে যাইব। সাধুচরণের সমস্ত জমি আমি নিজ নামে খরিদ করিয়া লইয়া, তাহাকে আমার জমিদারীতে মৌরসী পাট্টা লিখিয়া দিব। দেখি হরনাথ বাবুর কত ক্ষমতা।

রাম।—জগতে আপনিই যথার্থ মনুষ্য-নাম ধারণের উপযুক্ত। জগদীশ্বর করুন, আপনার যেন সকল দিকে জয়লাভ হয়। অধিক আর আপনাকে কি বল্‌বো?—আপনি দীর্ঘজীবি হ'য়ে এইরূপে সকলের উপকার সাধনে ব্রতী থাকুন।

আত্ম প্রশংসা শ্রবণে, স্মরদেব বাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া, অন্য কথার অবতারণা করিয়া কহিলেন, "কিশোরীলালের এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ভাল, ডেপুটী বাবু কি ইতিমধ্যে আর এখানে এসেছিলেন?"

রাম।—আপনি বাহিরে গেলে. তিনি একবার এখানে এসেছিলেন। তিনি নাকি এবার অনেক দূরে বদলি হ'য়ে গেছেন।

স্মর।—কোথায়,—জান?

রাম।—মধুপুর।

স্মর। তবে আর শীঘ্র তাঁর সঙ্গে দেখা হবার কোন উপায় নাই। তিনি নিকটে থাকলে, এ সময়ে আমার বড় উপকার হ'তো।

রাম।—তিনি বড় চমৎকার লোক।

স্মর।—অমন বুদ্ধিধারী আর পরোপকারী লোক, আমি ত আর দেখিতে পাই না

স্মরদেব বাবু রামদয়াল সরকারের সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন আগন্তুক দ্রুতপদে আসিয়া স্মরদেব বাবুর হস্তে একখানি পত্র দিল। স্মরদেব বাবু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, পত্রখানি খুলিয়া পড়িয়া একবার শিহরিয়া উঠিলেন! পত্রবাহকের অনুসন্ধানে ইতঃস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি আরও বিস্মিত হইয়া, পার্শ্বস্থ অনুচরকে পত্রবাহকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া, তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিলেন!—তবুও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন নিশ্চয় করিলেন যে, পত্রবাহক পত্র দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতও তাহাই। সে সেই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করিয়াছিল।

স্মরদেব বাবু পুনর্ব্বার স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

"যদি সাধুচরণের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া এই দণ্ডে কাঞ্চনপুরে রওয়ানা হইবেন। কারণ, কোন দুষ্ট লোকের প্রবর্ত্তনায়, অদ্য রাত্রে তাহার বাটীতে ডাকাইতি হইবে। এবং বোধ হয়, সেই সঙ্গে তাহার কন্যাও অপহৃত হইবে। ডাকাইতেরা জলপথে আসিবে।"

পত্রে কাহারও নাম না দেখিয়া স্মরদেব বাবুর অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল। তিনি যে কি করিবেন, প্রথমে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, নিকটস্থ ফাঁড়ীতে সংবাদ দিয়া পুলিসের লোকজন সঙ্গে করিয়া লইবেন। আবার ভাবিলেন, পুলিসে সংবাদ দিতে এবং লোক সংগ্রহ করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিতে পারে। আর সে স্থান হইতে সাধুচরণের বাটী প্রায় তিন ক্রোশ। পদব্রজে যাইলে, দুই ঘণ্টার কমে পঁহুছিতে পারা যাইবে

না। নৌকা পথেও ততোধিক সময় লাগিবে। তবে অশ্বারোহণে গমন করিলে, অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক লোকের জন্য অশ্ব কোথায় পাইবেন? অথচ একাকী যাইলেও কোন কার্য্য হইবে না। এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে, তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি আর কালবিলম্ব অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, ভৃত্যকে অশ্ব সুসজ্জিত করিতে আদেশ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। শীঘ্র শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দুইটী ডবল ব্যারেল পিস্তল লুকাইয়া, পুনর্ব্বার বহির্ব্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক অশ্বারোহণে কাঞ্চনপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় রামদয়ালকে বলিয়া গেলেন যে, শীঘ্র যেন জনকতক পাইক ও সড়কীওয়ালা যোগাড় করিয়া কাঞ্চনপুরে পাঠান হয়।

রামদয়ালও, স্মরদেব বাবুর আজ্ঞামত পাইক সড়কীওয়ালার তল্লাসে বহির্গত হইল।

বিপদ।

স্মরদেব বাবু যখন অনন্তপুর হইতে রওয়ানা হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। সে দিন যদিও শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি, তথাপি সময় দোষে আকাশের পশ্চিমদিকে ঈষৎ মেঘের সঞ্চার দেখা দিল। ক্রমে সমস্ত আকাশমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তপুর ও কাঞ্চনপুরের মধ্যে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রান্তরটী দীর্ঘে প্রায় দুই ক্রোশ। স্মরদেব বাবু আকাশের এবম্বিধ দুর্য্যোগ দেখিয়া অশ্বের পৃষ্ঠে সজোরে কশাঘাত করিয়া দিলেন। অশ্ব প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু মাঠের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতে, মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; স্মরদেব বাবু ভিজিতে লাগিলেন, কি করিবেন, উপায় নাই। তিনি ক্রমাগত অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্ব প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। তাঁহার গতির বিরাম নাই,—বৃষ্টিরও বিরাম নাই। তিনি অন্ধকারে কোন পথে কোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যদিও মধ্যে মধ্যে এক একবার, মেঘমালার সংঘর্ষণে বিদ্যুদ্দাম উত্থিত ও উদ্ভাসিত হইতেছিল,

কিন্তু তাহাতে তাঁহার পথ পরিজ্ঞানে সাহায্য না হইয়া, বরং পথশ্রম আরও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং তিনি অশ্বরজ্জু একেবারে শ্লথ করিয়া দিলেন। অশ্ব স্বেচ্ছামতে পথ চিনিতে চিনিতে সার্দ্ধ দুই ঘণ্টাকাল পরে, একটী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় বিদ্যুতালোক প্রভাসিত হওয়াতে স্মরদেব বাবু দেখিতে পাইলেন যে তিনি একটী ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে দিকে আর পথ নাই। তখন বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং, সেই স্থানে কোন অংশে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করা বিধেয় বিবেচনা করিয়া, অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। এবং পুনর্ব্বার বিদ্যুতালোকে সেই অট্টালিকার প্রবেশদ্বার দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি অশ্বকে সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া, সেই পথে প্রবিষ্ট হইলেন।

স্মরদেব বাবু ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড দালানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলেন। এবং কালবিলম্ব না করিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ সেই দালানের ভিতরে এক পার্শ্বে গিয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। আকাশমণ্ডলও দেখিতে দেখিতে বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। পুনর্ব্বার জ্যোৎস্না দেখা দিল। তখন স্মরদেব বাবু গন্তব্য স্থানে গমনের জন্য, অট্টালিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে স্থানে অশ্ব রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানে তাঁহার অশ্ব দেখিতে পাইলেন না। চারিদিক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই ভগ্ন অট্টালিকার পার্শ্বে একটা আম্রকানন ছিল। তিনি অশ্বের অনুসন্ধানে সেই আম্রকানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্মরদেব বাবু যেমন আম্রকানন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি দুই জন ভীমকায় পুরুষ শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপে, তাঁহার পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিল, এবং নিমেষ মধ্যে তাঁহার হস্ত পদ ও মুখ আবদ্ধ করিয়া, দুইজনে তাঁহাকে বহন করিয়া আম্রকাননের পার্শ্বস্থিত একটী গুপ্তদ্বার দিয়া সেই জীর্ণ অট্টালিকার একটী কক্ষ মধ্যে লইয়া গেল। ফলকথা, স্মরদেব বাবু দস্যুদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। পরের উপকার করিতে আসিয়া, নিজের বিপদ ঘটাইলেন। দস্যুদ্বয় তাঁহাকে সেই কক্ষ মধ্যে লইয়া গিয়া, তাঁহার কাছে পিস্তলাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই আত্মসাৎ করিল। অনন্তর তাহারা কেবল তাঁহার মুখের বন্ধন মুক্ত করতঃ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

স্মরদেব বাবু একাকী বদ্ধাবস্থায়, সেই অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন।

পাঠকগণ! স্মরদেব বাবু এখন এই ভাবেই দস্যুকবলে নিপতিত থাকুন। চলুন, আমরা একবার সাধুচরণ দের বাড়ীতে গমন করি। সাধুচরণ কে? তাহার কন্যাই বা কে,—কিরূপ? কোন্ দুষ্টলোকে তাহার বাড়ীতে ডাকাইতি করিবার কল্পনা করিয়াছে? তাহার প্রতি হরনাথ বাবুর এত আক্রোশ কি জন্য?—চলুন, এই সকল বিষয়ের একবার তদন্ত করিগে। কেবল এক কথা লইয়া নাড়া চাড়া করিলে কি হইবে? সকল দিকে দেখা চাই,—সকল কথা জানা চাই। তবে ত রস পাবেন;—মজা পাবেন।—রহস্য জান্‌তে পারবেন। —আসুন তবে!

রত্নময়ী—দানপত্র।

কাঞ্চনপুরের উত্তর প্রান্তে সাধুচরণ দের বাসবাটী। সাধুচরণ মধ্যবিৎ গৃহস্থ। নিকটবর্ত্তী গ্রামে সাধুচরণের বেশ মানসম্ভ্রমও আছে। বিষয় সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি পৈতৃক লাখরাজ জমি, আর নগদ কিঞ্চিৎও আছে। সেই লাখরাজ লইয়াই হরনাথ বাবুর সহিত তাঁহার বিবাদ। সাধুচরণের বাস করেদের জমিদারীর মধ্যে। তাঁহার সাত পুরুষ সেই সমস্ত জমি নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কখনও কাহাকেও এক কপর্দ্দক খাজনা দিতে হয় নাই। কিন্তু এতদিনের পর হরনাথ বসু কাগজপত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন যে, সাধুচরণ লাখরাজ বলিয়া সে সমস্ত জমি ভোগদখল করিতেছে, তাহা মালের। তাহার পিতা, পিতামহ বরাবর সে সকল জমির খাজনা দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে সাধুচরণ খাজনা বন্ধ করিয়াছে। এই বলিয়া হরনাথ বসু সাধুচরণের নামে দেওয়ানী আদালতে এক আরজী দাখিল করেন। প্রায় দুই তিন বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা চলে। সাধুচরণ সামান্য তালুকদার। হরনাথ বসু একজন জমিদার খুব—ধনীলোক। হরনাথের অর্থের অপ্রতুল নাই।

সাধুচরণ ক্রমে মোকদ্দমা চালাইতে কাতর হইয়া পড়িলেন। যা কিছু সঞ্চিতার্থ ছিল, এই মোকদ্দমায়, সে সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল। ক্রমে দুই একখানি জমি বন্ধক পড়িতে লাগিল।

স্মরদেব বাবু এই মোকদ্দমার কথা শুনিলেন। সাধুচরণের জমি জারাৎ সম্বন্ধে যাবতীয় ঘটনা তাঁহার জানাশুনা ছিল। তিনি হরনাথ বসুর এই প্রকার অত্যাচারের কথা শুনিয়া সাধুচরণের রক্ষার্থ উদ্যোগী হইলেন। স্বয়ং অযাচিত অবস্থাতেই সাধুচরণের বাটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মোকদ্দমা চালাইবার ভারগ্রহণ করিলেন।— ক্রমে ঈশ্বরেচ্ছায় মোকদ্দমায় সাধুচরণের জয়লাভ হইল। হরনাথ সাধুচরণের নিকট সমস্ত খরচা ও খেসারতের দায়ী হইয়া পড়িলেন।

এই মোকদ্দমার সূত্র হইতেই সাধুচরণ ও স্মরদেব বাবুর প্রতি হরনাথ বসুর জাতক্রোধ। কিরূপে এই দুইজনের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, সেই চেষ্টাতেই হরনাথ বাবু দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারিলেন না, তখন উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, দুইজন নিরীহ ভদ্রলোকের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। ঠিক সেই সময়ে, তাঁহার একজন প্রধান সহকারী আসিয়া জুটিল। সেই সহকারী অপর কেহই নহে,—আমাদিগের বিশেষ পরিচিত হাকিম সাহেব। পাঠকবর্গ হাকিম সাহেবকে এখনও ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই। তবে এই অবসরে তাঁহার আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া রাখি।

হাকিম রঘুনাথ সার চিকিৎসার ব্যবসাটা কেবল বুজরুকি। জালজালিয়াৎ জুয়াচুরি, চাটুকারিতাতেই তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে, কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে, মানুষের ছেলেকে উৎসন্ন দিতে তিনি বিশেষরূপ পটু ছিলেন। তবে চিকিৎসার মধ্যে, ধাত্রীবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। কারণ সময়ে অসময়ে, অনেকস্থলে অনেক বড়লোকের বাড়ীতে, তাহাকে গুপ্ত প্রসব করাইতে হইত। আর সেই কার্য্যকুশলতাই, তাহার যথেচ্ছা অভিষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া সুখসম্ভোগ করাইয়া দিয়াছিল। এক কথায়, হাকিম সাহেব একটী বর্ণচোরা আঁম। সহজে তাঁহাকে চিনিবার যো ছিল না। মুখের আস্ফালনে, তাঁহার মনের ভাব কেহ বুঝিতে পারিত না। তিনি নারী সমাজে, নারী সাজিতেন, পুরুষের

কাছে পুরুষ। আর কাপুরুষমহলে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু লাভের অঙ্কুর তাঁর সকল দিক্ হইতেই উৎপন্ন হইত। তিনি গাছেরও পাড়িতেন, তলারও কুড়াইতেন। সকল দিকেই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল।

এই হাকিম সাহেব ঠিক সময় বুঝিয়াই, হরনাথ বাবুর নিকটে আসিয়া জুটিলেন। ইহাঁরই পরামর্শতে হরনাথ বাবু সংসারের কুটিলপথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। হাকিম সাহেব মন্ত্রী—হরনাথ বাবু কার্য্যকারক! হাকিম সাহেব কুটমন্ত্রের উপদেষ্টা—হরনাথ বসু কুটিলকার্য্যের অভিনায়ক!—উপস্থিত ক্ষেত্রে হাকিম রঘুরাম সা, হরনাথ বাবুর দক্ষিণ হস্ত।

মোকর্দ্দমার পর হইতে হরনাথ বসু কৌশল খুঁজিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনোমত সুযোগ ঘটিয়া উঠিল।

সাধুচরণের সংসারে থাকিবার মধ্যে তাঁহার একটী পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা, আর একটী বয়স্থা বিধবা ভগিনী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার আত্মীয় পরিবার-বর্গীয় আর কেহই ছিল না। কন্যাটীর নাম রত্নময়ী, না—যথার্থই রত্নময়ী। পরমা সুন্দরী! সুপাত্র অভাবে সাধুচরণ এতদিন রত্নময়ীর বিবাহ দিতে পারেন নাই। কন্যা ও ভগিনী ব্যতীত, বাটিতে দুইজন চাকর, একজন চাকরাণী তিনজন চাষীলোক থাকিত।

পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা উপলক্ষে, স্মরদেব বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সাধুচরণের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। স্মরদেব বাবু সাধুচরণের অযাচিত মিত্র। সাধুচরণ স্মরদেব বাবুর রূপে ও গুণে একান্ত তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়া ছিলেন। স্মরদেব বাবুও সাধুচরণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন সাধুচরণ স্মরদেব বাবুকে বাটিতে আহার করাইবার ঐকান্তিকী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্মরদেব বাবু সাধুচরণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে স্মরদেব বাবু আহার করিবার জন্য সাধুচরণের অন্দর মহলের মধ্যে গেলেন। উভয়ে একত্রে আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় সাধুচরণ আপন কন্যাকে নিকটে ডাকিলেন। পিতার আদেশমতে রত্নময়ী ব্রীড়াবনত বদনে আহারস্থানে আসিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। সাধুচরণ কহিলেন, "রত্ন! পাখাখানা লইয়া স্মরদেব বাবুকে একটু বাতাস কর। দেখ্‌ছ না, উনি কত ঘাম্‌ছেন।"

বলিবামাত্র, রত্নময়ী একখানি পাখা লইয়া আসিল। কিন্তু নবযৌবন

প্রারম্ভে নূতন লজ্জায়, নূতন মানুষ দেখিয়া মেয়েটি কিরকম জড়িত হইয়া, পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল,—বাতাস করিতে পারিল না।

সাধুচরণ কন্যার ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—"লজ্জা কি, মা? উনি কি আমাদের পর?"

স্মরদেব বাবু রত্নময়ীর প্রতি সানুরাগ কটাক্ষপাত করিয়া, সাধুচরণের উদ্দেশে কহিলেন, "না, থাক্, আর বাতাস করিতে হইবে না। আমার তত গ্রীষ্মবোধ হইতেছে না, ঘর্ম্মটা আমার বেশী হইয়া থাকে।

বালিকা রত্নময়ী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া, একহস্তে পাখাখানি ধরিয়া অপর হস্তে তাহা খুঁটিতে লাগিল। স্মরদেব বাবু আহার করিতে করিতে, এক একবার রত্নময়ীর আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গে অপাঙ্গে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দুই একবার চারি চক্ষের মিলনও হইয়া গেল। কিন্তু সুচতুর সাধুচরণের এ সমস্ত কিছুই অলক্ষ্য রহিল না! তিনি আকার ইঙ্গিতে, ভাব-ভঙ্গিতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন।

আহারান্তে উভয়ে বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপবেশন করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা প্রকার কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় স্মরদেব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কন্যাটী বেশ—বড় পরিষ্কার অতি চমৎকার"

সাধুচরণ হর্ষোৎফুল্লবদনে কহিলেন,—"আমার যা কিছু সবই এক কন্যা-রত্ন।—এটি লইয়াই আমি সংসারী!"

স্মর। আপনার রত্নময়ী যথার্থই একটী রত্নবিশেষ।—বিবাহ দিয়াছেন কোথায়?

সাধু।—রত্নময়ীর অদ্যাবধি বিবাহ হয় নাই।

স্মর। কেন? বিবাহের বয়স ত প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে!—কেমন, নয় কি?

সাধু। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া) হাঁ, উত্তীর্ণ যদিও নয়, যোগ্যা বটে। তবে কি না উপযুক্ত সৎপাত্রে কন্যাটীকে সম্প্রদান করিবার কল্পনা থাকায় এ পর্য্যন্ত পাত্রস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই।

স্মর। কেন? তেমন কি উপযুক্ত পাত্র পান নাই?

সা। তেমন কই! দেখুন, সংসারে আমার ঐ কন্যা ব্যতীত আর কেহ নাই। ইচ্ছা আছে যে, একটী সদ্‌গুণযুক্ত পাত্রে কন্যাটীকে সমর্পণ করিয়া,

আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাসী হই। কিন্তু কপালক্রমে এ পর্য্যন্ত তেমন একটী সুপাত্র জুটিয়া উঠিতেছে না। বিশেষতঃ, এই দুই বৎসর ধরিয়া অকারণ কেবল এই মিছে মামলা-মোকর্দ্দমার গোলমালে কাটিয়া গেল; আর কোন কার্য্যই করিতে পারি নাই। মেয়েটীর বিবাহের ভাবনা ভাবিবারও অবকাশ পাই নাই।

স্মর। যা হোক, এখন ওসব এক প্রকার ত মিটে গেল। আর আপনার কোন ভাবনা নাই।

সা। সে সকলই আপনার অনুগ্রহে। আপনি আমার নিঃস্বার্থ সুহৃদ। আপনি যদি স্ব ইচ্ছায় এসে অমন করে আমাদের সাহায্য না কত্তেন, তা হলে কি আর আমি এ যাত্রা রক্ষা পেতাম, নিশ্চয়ই ধনে প্রাণে মারা যেতাম! আপনি আমাকে স্বগতঃ পরতঃ রক্ষা করেছেন। আপনার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারবো না। আপনার গুণ, মলেও, ভুল্‌তে পারবো না।

সদাশয় স্মরদেব বাবু আত্মপ্রশংসা স্বকর্ণে শ্রবণে শুনিতে ভাল বাসিতেন না। সাধুচরণের এই প্রকার প্রশংসাবাদে, তিনি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আপনার ন্যায্য বিষয় আপনি পাইলেন, তাহাতে আমার গুণ বা সাহায্য কিসের? ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় চিরকালই হয়ে আস্‌ছে। পাপিষ্ঠ হরনাথ অন্যায়াচরণ করে আপনার বিষয় সম্পত্তি বেদখল করে নেবার ইচ্ছা করেছিল, এবং যোগাড় যন্ত্রও করেছিল। কিন্তু আদালতে ন্যায্য বিচারে তার জারিজুয়াচুরি কিছুই খাট্‌লো না; আপনারই জয়লাভ হলো! "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই যে শাস্ত্রের কথা, এটা কখন মিথ্যে হবার নয়। এখন এক কাজ করুন। খরচা আর খেঁসারতের দাবী দিয়ে, হরনাথের নামে নালিশ করুন। এই দুই বৎসর মোকর্দ্দমায় আপনার কি অল্প খরচ হয়েছে?"

সা। খরচ—বলে খরচ! গহনা পত্র পর্য্যন্ত টান পড়েছিল। আপনি ছিলেন তাই, এ যাত্রা উদ্ধার কল্লেন। নতুবা যে কি হ'তো তা বল্‌তে পারি না।

স্মর। ওকথা আপনি পুনঃ পুনঃ বলবেন না। আমায় আর লজ্জায় ফেলবেন না। আমার দ্বারা কি হতে পারে? জানিবেন, জগদম্বা সহায় না হইলে, কিছুতেই কিছু হয় না।

সা। আমি আর কি করবো? আপনি যা ভাল বুঝেন, তাই করবেন। আপনার উপর সমস্তই ভার। এক্ষণে আমার একটী অভিলাষ আছে। সেটীতে আপনি অমত কর্ত্তে পারবেন না।

স্মর। কি, বলুন; আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে অবশ্য আমি তাতে সম্মত হ'ব। আপনার কোনও উপকার করিতে আমি কখনই কোন মতে পশ্চাদ-পদ নই।

অনন্তর সাধুচরণ বাটীর মধ্যে উঠিয়া গেলেন। স্মরদেব বাবু কিয়ৎক্ষণের জন্য একাকী হইলেন। একাকী বসিয়া, স্মরদেব বাবু অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। রমণীপ্রেমের অমৃত-ময় আস্বাদে, তিনি অদ্যাপি বঞ্চিত। রমণীর প্রেমের প্রতিরূপ এ পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে প্রতিঘাত হয় নাই। অদ্য সাধুচরণের বাটীতে—সাধুচরণের কন্যাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়ের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে,—নির্ম্মল হৃদয়ে মলিনতা আসিয়া দেখা দিয়াছে। রত্নময়ীর অনুপম রূপরাশি তাঁহার হৃদয় একেবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। স্মরদেব বাবু এখন বুঝিয়াছেন যে, জগতে যদি কিছু সুখের পদার্থ থাকে, তবে রমণী, যদি কিছু দর্শনীয় থাকে, তবে নারীজাতির সরল-বিলোল-কটাক্ষ সঞ্চারক মদনশরসংযোজক ভ্রূযুগল যুক্ত, নয়নযুগল! জগতে যদি কিছু প্রার্থনীয় প্রিয় বস্তু থাকে, তবে রমণীর ভালবাসা।—স্মরদেব বাবুর পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! তাঁহার বোধ হইতেছে যেন, তিনি এতদিনে কোন নূতন জগতে নূতন জীবরূপে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তাঁহার ভাগ্যে কি রত্নময়ী-লাভ ঘটিবে? তিনিই কি প্রথম প্রার্থী হইবেন? প্রার্থনা কি তাঁহার পূর্ণ হইবে?—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের চিত্র তাঁহার চিত্তপটে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কখন বা রোমিও-জুলিয়েট স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবপ্রণয় পিপাসু বাবুটী প্রণয়-প্রণয়ীদিগের বিবিধ চিত্র পর্য্যায়ক্রমে আপন হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিয়া পরম পবিত্র প্রণয়ের অনির্ব্ব-চনীয় সুখাস্বাদের সমালোচন করিতে করিতে কিয়ৎকাল বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন।

অর্দ্ধ ঘটিকা অতীত হইলে, সাধুচরণ অন্তঃপুর হইতে একখানি কাগজ আনিয়া স্মরদেব বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন! স্মরদেব বাবু কাগজখানি পাইয়া

আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, সাধুচরণ দে নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহাকে দানপত্রে লিখিয়া দিয়াছেন। এখানি সেই দানপত্রের অনুলিপি। সেখানি পাঠ করিয়া স্মরদেব বাবু কহিলেন, "আপনি এরূপ দানপত্র প্রস্তুত করিয়া ভাল করেন নাই। আপনার কন্যা এখনও অবিবাহিতা—"

সা। সেই বিষয়েই আমার এই অভিলাষ যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সঙ্গে আমার রত্নময়ীকে গ্রহণ করেন। আমি জোর করিয়া আপনাকে কিছু বলিতে পারি না। কুলমর্য্যাদায় আমি কোন অংশেই আপনার সমকক্ষ নই। তবে———

স্মর। আপনার কন্যা একটী অমূল্যরত্ন। দেব দুর্লভধন! আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার রত্নময়ীকে আমায় সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে আত্মাকে আমি কৃতার্থ ও পরম সুখী জ্ঞান করি। আহা! রত্নময়ী রমণী-শিরোমণি——

সা। তাহা হইলে আমিও পরম অনুগৃহীত হই। অধিক আর কি বলিব, এতদিনে একটা দায় হইতে মুক্ত হই। আমার সকল ভাবনা দূর হয়। এখন বুঝিলাম যে, বিধাতা নিশ্চয়ই আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন।

স্মর। কিন্তু আপনাকে আর ছয় মাস কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। যে হেতু আজ ছয়মাস অতীত হইল, আমার মাতাঠাকুরাণীর ৺ কাশীধাম প্রাপ্তি হয়েছে। আর ছয়মাস কালাশৌচ না গেলে, কিরূপে বিবাহ হইবে?

সা। আপনি যখন স্বীকৃত হইলেন, তখন আমার আর কোন চিন্তা নাই। এখন ছয়মাস কেন? আর এক বৎসর অতীত হলেও, কিছুই ক্ষতি বোধ হইবে না,—নির্ভাবনায় থাকিতে পারিব।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, স্মরদেব বাবু সে দিনের জন্য, সাধুচরণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর সাধুচরণ, স্মরদেব বাবু এবং স্বপক্ষীয় উকিলগণের পরামর্শানুসারে হরনাথ বসুর নামে খরচা ও খেসারত বাবদে নালিশ ঠুকিয়া দিলেন। মোকর্দ্দমায় হরনাথ বসুর হার হইল। উপর্য্যুপরি দুইবার হার হওয়াতে হরনাথ বসুর ক্রোধবহ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিসে স্মরদেবের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার পর আবার যখন শুনিলেন যে, সাধুচরণের কন্যার সহিত স্মরদেবের

বিবাহ হইবে, এবং সাধুচরণের কন্যা রত্নময়ী পরমাসুন্দরী, তখন তাঁহার ঈর্ষার আর ইয়ত্তা রহিল না। অনেক যুক্তি, অনেক মতলব আঁটিয়া পরিশেষে সাধুচরণের কন্যাকে হরণ করিবেন স্থির করিলেন। এবং সেই দিন পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাকালে হাকিম সাহেব ও জনকতক লাঠিয়ালকে নৌকাযোগে কাঞ্চনপুরে পাঠাইয়া দেন। তাহার ফল কি হইল, পাঠকগণ ক্রমে তাহা অবগত হইবেন।

রত্নময়ী হরণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণা। রত্নময়ী নিজ শয়নগৃহে বসিয়া পান সাজিতেছে। নিকটে সাধুচরণের ভগ্নী বসিয়া একখানি কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেছেন। ভগিনীর নাম বিমলা, সাধুচরণের জ্যেষ্ঠা। সৈদপুরে দত্তদের বাড়ীতে বিমলার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরেই বিমলা বিধবা হয়েন। বিধবা হইয়া দশ বার বৎসর কাল বিমলা শ্বশুর বাড়ীতেই ছিলেন।—তাহার পর, তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী সকলেরই মৃত্যু হওয়াতে, শ্বশুর বাড়ীর জমীজারাৎ বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ ও তৈজসপত্রাদি লইয়া, সহোদরের আশ্রয়ে আসিয়া, বাস করিলেন। সেই অবধি প্রায় আঠার বৎসর সহোদরের কাছেই আছেন। সাধুচরণের সংসারে অভিভাবিকা স্ত্রীলোক আর কেহই ছিল না। সাধুচরণের যখন ২১।২২ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর কাল হয়। পরে রত্নপুরের লোকনাথ বিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের তিন বৎসর পরেই তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকা-গারেই কালগ্রাসে পতিত হয়। বিমলা সেই কন্যাটীকে লইয়া সযত্নে লালন-পালন করেন। এবং অতিশয় রূপবতী ও নিজের আদরের ধন বলিয়া, মেয়েটির নাম রত্নময়ী রাখেন। সুতরাং এই রত্নময়ী মাতৃহারা হইয়াও কষ্ট বা মাতৃশোক অনুভব করিতে পায় নাই। পিসীকেই 'মা' বলিয়া ডাকিতেন,

'মা' বলিয়া জানিতেন। বিমলাও রত্নময়ীকে আপন গর্ভজাত সন্তানাপেক্ষাও স্নেহ মমতা করিতেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর সকলেই সাধুচরণকে পুনর্ব্বার দার গ্রহণের অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে মহাশয় সে বিষয়ে আর সম্মত হন নাই।

সে যাহা হউক পান সাজা শেষ হইলে রত্নময়ী বিমলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"মা! বাবা কি আজ আসিবেন না?"

সাধুচরণ সেই দিন প্রাতে হুগলি যাত্রা করিয়াছিলেন। বলিয়া গিয়াছিলেন, যে, তাঁহার প্রত্যাগমনে দুই এক দিন বিলম্ব হইবে।

বি। তিনি এখন দুই তিন দিন আসিবেন না।

র। তবে আমরা একলা কেমন করিয়া থাকিব?

বি। একলা কেন?—আমি রহিয়াছি, ঝি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বাড়ীতে আরও ৭।৮ জন কৃষাণ রহিয়াছে। আর এমনও ত তিনি মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে গিয়া থাকেন।

র। আজ কিন্তু মা আমার মনটার ভিতর কেমন ভয় কচ্ছে। কেন, মা, আজ আমার এমন হলো?—কই অন্য অন্য বার ত এমন কখন হয় না!

বি। ও কিছু নয়। এই একটু মহাভারত শোন। অন্যমনস্ক হলেই মন সুস্থির হবে এখন।

র। হাঁ মা, তবে দুষ্মন্তরাজার কথাটী বল না?—যেখানে শকুন্তলা সেই ফুলগাছে জল দিচ্ছেন, আর মহারাজ বৃক্ষের অন্তরাল হতে গোপনে শকুন্তলা আর প্রিয়ম্বদার কথাবার্ত্তা শুন্‌ছেন। সেই—সেইখানটা বল না মা, শুনি। শকুন্তলার গল্পটী বড় মিষ্ট লাগে, কেমন,—না মা?

বি। আবার সাবিত্রী-সত্যবানের কথা আরও ভাল। সাবিত্রী যখন যমরাজের কাছ থেকে বর নিচ্ছেন, সেখানটী পড়লে আর জ্ঞান থাকে না।

র। তবে সেইটীই পড় না, মা!

বিমলা মহাভারতের সাবিত্রী উপাখ্যান বাহির করিয়া যেখানে গভীর নিশীথে ঘোর অরণ্য মধ্যে পতিপ্রাণা সাবিত্রী মৃতপতিকে ক্রোড়ে করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত বাদানুবাদ করিতেছেন, সেই স্থানটী আরম্ভ করিলেন। বিমলা সুর করিয়া একমনে পড়িতে লাগিলেন। রত্নময়ী কিয়ৎক্ষণ শুনিতে

শুনিতে অন্যমনস্কা হইয়া পড়িল। নবপ্রেমিকার হৃদয়ে প্রেমসূত্রে গাঁথা—প্রেমের কথা বড়ই ভাল লাগে! বিরহের দারুণ বেদনা সে কোমল প্রাণে এখন স্থান পাইবে কেন? তাই সাবিত্রী উপাখ্যান রত্নময়ীর ভাল লাগিল না।

অকস্মাৎ স্মরদেবের মনোহর মূর্ত্তি তাহার চিত্তপটে জাগিয়া উঠিল। যে দিন বিরলে বসিয়া তাহাদের কথোপকথন হইয়াছিল, স্মরদেববাবু স্বহস্তে যেদিন রত্নময়ীকে রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া দিয়াছিলেন, রত্নময়ীর চিবুক ধরিয়া কত শত আদর করিয়াছিলেন—রত্নময়ী একান্তচিত্তে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বিহ্বল হইয়া পড়িল। বিমলা যে সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়িতেছিলেন, সেদিকে তাহার মন রহিল না। এখনও ত শোক অনুভবের, বা বিরহ বুঝিবার শক্তি বা সময়, তাহার হয় নাই। তাহার সে সব ভাল লাগিবে কেন?

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতীত হইলে, একজন পরিচারিকা আসিয়া রত্নময়ীর হস্তে একখানি পত্রপ্রদান করিল। কুতূহলী হইয়া খুলিয়া পড়িল।

প্রাণাধিকা রত্নময়ী!

আমার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত। যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে পত্র পাঠ এই পরিচারিকার সহিত চলিয়া আসিবে। ইহার সঙ্গে পাল্কী বেহারা ও দ্বারবান পাঠাইয়া দিলাম। আর কিছু অধিক লিখিতে পারিলাম না, যা কিছু মনের কথা আছে, এখানে আসিলেই শুনিতে, বুঝিতে পারিবে, ইতি—

তোমারি স্মরদেব দাস ঘোষ—

বঃ রামদয়াল সরকার—

পুঃ———

শুনিলাম, তোমার পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে হুগলি গিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাকিলে বোধ হয়, আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

এইরূপ লেখা পড়িয়া রত্নময়ীর মাথা ঘুরিয়া গেল।—উপস্থিত কি করিবে, কি হইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বিমলা পত্রের মর্ম্ম শুনিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সে বাটীতে কখন তাঁহাদের গতিবিধি নাই। বিশেষতঃ ভাই বাটীতে নাই। কিন্তু কি করিয়া অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের সহিত অর্দ্ধ যুবতী কন্যাকে সন্ধ্যাকালে পাঠাইয়া দেন। আবার স্মরদেব বাবুর সাঙ্ঘাতিক পীড়া। যাহা হইতে

তাঁহাদের মানসম্ভ্রম, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত রক্ষা পাইয়াছে, সেই স্মরদেব বাবুর পীড়া—সাঙ্ঘাতিক পীড়া! রত্নময়ীর হৃদয়চিন্তামনি স্মরদেব হয় ত মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন! এ সংবাদ শ্রবণে স্থির হইয়াই বা কিরূপে থাকেন? এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন. "কি হবে রতন তবে?"

রত্নময়ী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিল। তাহার বুক ফাটিয়া. চক্ষু ফাটিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু গড়াইতে আরম্ভ হইল; পিসীর কথায়, প্রাণের ব্যথায় কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

বি। এ সময় অধীর হইলে কি হবে? একটু স্থির হও মা।—(দাসীকে লক্ষ্য করিয়া) অসুখটা কি?

পত্রবাহিকা পরিচারিকা এতক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণে, সে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"ব্যায়রাম কিছুই হয় নি।"

বি। তবে?

পরি। বাবুকে শত্রুরা খুন করেছে,—

বি। খুন!—খুন!!—সে কি?

পরি। খুন, বোলে খুন! কেবল ধড়ে প্রাণটুকু আছে মাত্র!—(স্কন্ধদেশ হইতে কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দেখা যায়) এতদূর ছোরা বসাইয়া দিয়াছে। এই বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বি। এঁ এঁ—বল কি?

পরি। সর্ব্বনাশ, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে। এই আজ সকাল বেলায় বাবু নদীর ধারে ধারে বেড়াচ্ছিলেন, আর কালমতন একটা লোক, পেছুন থেকে দৌড়ে এসে একেবারে এক কোপ. এমন কোপ যে ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। তবে এক একবার যখন জ্ঞান হচ্ছে, তখন কেবল "রতন! র-ত-ন?" এই দুটী কথা উচ্চারণ কচ্চেন। তাই ডাক্তার কবিরাজ সকলে পরামর্শ ক'রে আমাকে এখানে পাঠালে। সরকার মশাই বাবুর জবানি এই পত্রে লিখে দেছেন। আপনি কাছে থাকলে হয়তো উনি ভাল হ'তে পারেন। আর বাড়ীতে ত 'তেমন অন্য মেয়ে লোক কেউ নেই যে, কাছে ব'সে সেবা শুশ্রূষা করবে?

এতদূর মর্ম্মান্তিকী দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া, বিমলা ও রত্নময়ীর মন একে

বারে আকুল হইয়া উঠিল। সেই সন্ধ্যাকালে অপরিচিত লোকের সহিত অপরিচিত স্থানে যাওয়াই রত্নময়ীর স্থির হইল। বিমলা ভাবিলেন, এইরূপ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে কেমন করিয়া আর স্থির হইয়া থাকিবেন? যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। এই ভাবিয়া বিমলা রত্নময়ীকে বেশ ভূষা পরাইয়া দিলেন। বহির্ব্বাটীতে স্মরদেব বাবুর পাল্কী ছিল। রত্নময়ী সেই অভ্যাগতা অপরিচিতা পরিচারিকার সহিত বিষাদ-বিদগ্ধ-অন্তরে যানে আরোহণ করিয়া অনন্তপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গে চলিল,—সাধুচরণের জনৈক কৃষাণ মাত্র। আর যে দুইজন দ্বারবান পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা অনুগমন করিল। পরিচারিকাটি সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বিমলা রত্নময়ীকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিয়া, নানরূপ বিপদ আশঙ্কা করিতে করিতে আপনকার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বেহারারাও "হিও হিও" করিতে করিতে ক্রমে সাধুচরণের পল্লী অতিক্রান্ত করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

পলায়ন—সন্ন্যাসীর আশ্রম।

সাধুচরণের বাটি হইতে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই প্রান্তর পারেই অনন্তপুরের সীমা আরম্ভ। প্রান্তরটী উত্তর দক্ষিণে প্রায় দুইক্রোশ হইবে। এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫।৬ ক্রোশ বিস্তৃত। বেহারারা পাল্কী লইয়া ক্রমে যখন উক্ত প্রান্তরের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া মেঘের সঞ্চার হইল। চতুর্দ্দিক গভীর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রত্নময়ী পাল্কীর ভিতর একাকিনী থাকিয়া কতই ভাবিতেছে। আত্মীয় স্বজনের বা প্রিয়জনের কোন বিপদের কথা শুনিলে, তৎসম্বন্ধে অশুভ চিন্তাই অগ্রে মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে! তাই, রত্নময়ী স্মরদেব বাবুর সমূহ অমঙ্গলই চিন্তা করিতেছিল!—একবার ভাবিতেছে, হয় ত গিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আবার ভাবিতেছে হয় ত, স্মরদেব বাবু

আমাকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন না! তিনি হয় ত চিনিয়া মনের কথা প্রাণের ব্যথা বলিতে পারিবেন না! এতাদৃশী ভাবনায় রত্নময়ীর পদ্মপলাশ-লোচন অশ্রুজলে ডব ডব করিতে লাগিল! ক্রমে আঁখি আপ্লুত করিয়া—বিম্বাধর ঈষৎ কাঁপাইয়া—আরক্তিম গণ্ডদেশ ভাসাইয়া নাতিপীনপয়োধর স্পর্শ করিতে লাগিল।

এইরূপে আরও অর্দ্ধঘটিকা অতিবাহিত হইলে, একটা বিকট চীৎকার শব্দ রত্নময়ীর কর্ণগোচর হইল। রত্নময়ী ভীতা ও চমকিতা হইয়া অল্পে অল্পে পাল্কীর দ্বার সরাইয়া, যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল! কিন্তু গাঢ় অন্ধকার বশতঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বেহারারা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে ঠিক উত্তর দিতে পারিল না; সুতরাং উৎকণ্ঠায় রত্নময়ীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল! বেহারারা আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

কিছু দূর যাইতে না যাইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন বেহারারা আর অধিক গমনে ক্ষান্ত হইয়া, নিকটস্থ একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষমূলে পাল্কী নামাইয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সহচর পাইক দুজন আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল। একজন পাইক বলিল,—"ব্যাটা বিষম যণ্ডারে।—তিন লাঠিতেও কাবু হলো না।"

২। ওকি তোর কর্ম্ম!—মুই কেমন এক আছাড়ে কাজ শেষ কল্লাম। এখন দেখ দেখি, ঘাটে নৌকো এসেচে কি না?

১ম। মুই আর ভিজে ভিজে যেতে পারিনে,—তুই যা।

২য়। হাঁ,—ট্যাকার বেলা সমান বক্‌রা নিতে পারবি ত?—

১ম। হাঁ,—টাকা ত ভারি!—এই এমন মালটা দিয়ে মোট পাঁচশ টাকা। তা আবার সাত বক্‌রা। এক শ করেও ভাগে পড়বে না।

২য়। সাত বকরা কিসে' হাঁ-রে?

১ম। এই আমার দু বক্‌রা, চারিজন বেয়ারা আর তুই।—

২য়। পুরুষ কি রসিক গা—নিজের বেলা দু বক্‌রা।

১ম। হবে না কেন? মোর নাম মধুসর্দ্দার।

২য়। মুরোদ ভারি। আমার দু বক্‌রা হওয়া উচিত।

১ম। আচ্ছা, তাই হবে।—এখন নৌকার খবরটা নিয়ে আয় দেকি!

তখন, সেই ব্যক্তি নৌকার খবর আনিতে নদীর অভিমুখে গমন করিল। সেখান হইতে দামোদর অতি সন্নিকটে। রত্নময়ী প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, বেহারারা তাহাকে লইয়া অনন্তপুরে যাইতেছে। কিন্তু এক্ষণে সর্দ্দার দুজনের কথাবার্ত্তা শ্রবণে তাহার মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। খুনের কথা, মাঠের মধ্যে সেই বিকট আর্ত্তনাদের শব্দ! বিশেষতঃ কৃষাণকে এবং সমভিব্যাহারিণীকে না দেখিয়া, আবার নৌকার কথা কর্ণগোচর করিয়া, রত্নময়ী স্থির করিল যে, নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোক কৌশল করিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। নতুবা অনন্তপুরে যাইতে নৌকা কেন? এই ভাবিয়া আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পাল্কী সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দেখিল যে, একজন বেহারা আর একজন সর্দ্দার কিয়ৎদূরে বসিয়া আস্তে আস্তে কি কথোপকথন করিতেছে। তখন সে নিঃশব্দে ডুলি হইতে নামিয়া সন্নিকটে কতকগুলি মাটীর চাপ দেখিতে পাইল। সেই চাপগুলি বুদ্ধি ক্রমে পাল্কীর ভিতর রাখিয়া নিজে অতি সাবধানে, অতিকষ্টে কোন মতে নিম্নস্থ শাখা অবলম্বনে সেই বৃক্ষোপরে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে আরোহণ করিল। বেহারা, কি অপর কেহই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে যে লোকটা নৌকার সন্ধানে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া সম্বাদ দিল যে, নৌকা তাহাদিগের জন্য ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে। তখন কাহারেরা সর্দ্দারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাল্কী স্কন্ধে উল্লাসে উচ্ছাসে নদীর অভিমুখে চলিল। বিস্তর মৃত্তিকার চাপ ছিল বলিয়া, তাহারা তখন অনুমান করিতে পারে নাই যে, তাহাদের লাভের ধন রত্নময়ী তাহাদিগকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে।

সর্দ্দার দুইজন নৌকায় গিয়া দেখিল যে, হাকিম সাহেব এবং উমাচরণ উভয়ে বহির্ভাগে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছেন।

হা। কৈ হে আন্‌তে পেরেছ?

মধু। হাঁ, আপনি যার উদ্দিশি করেছিলেন, তাকে এনেছি। এখন ট্যাকা?—

হা। মাল কইরে বেটা?

মধু। এই নিন, সঙ্গে সঙ্গেই হাজির, দেকে নিন, চেকে নিন, যা ইচ্ছে তাই করে নিন।

এই বলিয়া, মধুসর্দ্দার পশ্চাৎস্থিত ডুলে কাহারদিগকে পাল্কী নামাইতে বলিল।

মধুসর্দ্দারের কার্য্য দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া এক মুখ হাসিয়া হাকিম সাহেব কহিলেন, "তা না হলেরে কি তোকে পাঁচ পাঁচশো টাকা দেই। একেবারে থোক—আর যদিও আমি নিজে দিচ্চি না বটে, কিন্তু সে আমারই দেওয়া জান্‌বে। তা না হলে হরনাথ বোস তোকে চিনিত বা জানিত! আমিই তো বলিয়া কহিয়া তোর নাম করিয়া দিয়াছিলাম। দেখ, সেই তরফসিংহ বেটা একাই সব মার ত।

মধু। আজ্ঞে তা—তা—যা করেন, আপনি গরিবের মা বাপ। আর আপনার দৌলতেই ত আমি চিরকালই খেয়ে থাকি।—

অনন্তর হাকিম সাহেবের আদেশ মতে দুলেরা বজরার উপরে পাল্কী তুলিল। হাকিম সাহেব শশব্যস্তে খুলিয়া দেখিলেন যে, পাল্কীতে রত্নময়ীর পরিবর্ত্তে, কতকগুলা মৃত্তিকা রাশি রহিয়াছে। তদ্দর্শনে হাকিম সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন,—"তবেরে ব্যাটারা আমার সঙ্গে তামাসা! তোরা জানিস্ এইদণ্ডেই তোদের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারি!—সে মাল কোথা রেখে এলি?—শীঘ্র বল।"

মধুসর্দ্দার ভয়ে ও বিস্ময়ে ব্যস্ত ত্রাস্ত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"আজ্ঞে মেরা ত বরাবর ম-শা-ই সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছি! তবে একবার বড্ডি জল আসবার সময়ে মেরা এই পাল্কী নামিয়ে গেছতলায় খানিকটে দাঁড়িয়ে ছেলাম। এই যা কসুর হয়েছে, নইলে ত বরাবরই হুসিয়ার হয়ে আন্‌ছিলাম। তার পর কি জানি কি হলো—মেয়েটা কি ভেল্কী জানে।

হা। তা জানি না, মালচাই বাবা! যেখানে পাস্ বার করে নিয়ে আয়। না হলে, আজ আর কারও মাথা থাক্‌বে না!

২য়। মোর ত নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে, এই মেদোদাদা যেরকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কতা কচ্ছিলো, সেই সময় ছুঁরিটে সব শুন্‌তে পেয়ে, বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে কি রকম করে সরে গেছে।

মধু। আচ্ছা! মুই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কতা কচ্ছিলাম না, তুই কচ্ছিলি।

২য়। তুই ত?

মধু। তবে রে শালা, আমি চেঁচাচ্ছিলাম।—

এই বলিয়া মধুসর্দ্দার সবেগে দ্বিতীয় সর্দ্দারের গালে এক চড় মারিল।

তখন হাকিম সাহেব উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"তোরা বেটারা ত

ভারি পাজি! কাজে ত ভারি, এদিকে কাজের দফা রফা করে, এখন আপনা আপনি মারামারি বাধিয়ে দিয়ে বস্‌লি।—এই বেলা যা, শীঘ্র যা, যদিই বা খুঁজে বার করতে পারিস্। আর দেখ, যদি বেটীকে পাস্ ত আর এদিকে আনিস্‌নে, অমনি অমনি আমাদের আড্ডার দিকে নিয়ে গিয়ে ফেলিস্। এই নে, সে বাটীর চাবি নিয়ে যা।"

এই বলিয়া হাকিম সাহেব সর্দ্দার দুজনকে বিদায় দিয়া দুলেদের কহিলেন, "নে, ব্যাটারা তোদের খালি পাল্কা তুলে নে যা! বেটারা কোন কর্ম্মেরই ন'স্!

১ম। (মাথা চুলকাইয়া) আগে গে, মো-দে-র ট্যাকাটা?

হা। কি, টাকা কিসের? বেটাদের লজ্জা করে না?—তোদের হতেই ত হাতের মাল ফসকাল,—এই বিভ্রাট ঘটলো। এরকম অন্য কারও হাতে পড়্‌লে টের পেতিস।

তখন দ্বিতীয় দুলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"মোদের মশাই সব্বাই টের পাওয়ায়। একন ট্যাকা দেবেন না কি ঠিক করে বলে দেও?

হা। না, কখনই না, পারিস্ ত আদায় করে নিস্।

২য়। তাই নেবো!

এই বলিয়া দ্বিতীয় দুলে অপর তিন জনকে বলিল,—"আয় তোরা, মোর সঙ্গে আয়, মু ট্যাকা দেয়াব একন।

পরে তাহারা দ্রুতপদসঞ্চারে নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তীরে উঠিয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিল।

উমা। সত্য সত্যই যে বেটারা রেগে চলে গেল।

হা। গেল ত বয়ে গেল। ও বেটাদের আবার ভয় কি?

এদিকে সর্দ্দার দুজন সমস্ত প্রান্তর অন্বেষণ করিয়া কোথাও রত্নময়ীর সন্ধান পাইল না। তখন তাহারা বৃথা পরিশ্রম করিয়া, আর কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, রাত্রিটুকু কোন স্থানে কাটাইবার ইচ্ছা করিয়া ক্রমে তাহারা হাকিম কথিত আড্ডাবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, দ্বারদেশে একটী ঘোড়া দেখিতে পাইল। এমন সময়ে—এমন জনশূন্য অট্টালিকার দ্বারদেশে, সসজ্জ অশ্ব দর্শনে তাহারা দুইজনে অতীব বিস্মিত হইল। তখন সবে মাত্র বৃষ্টি ধরিয়াছে। ঘোড়া দেখিয়া মধুসর্দ্দার কহিল, "দেখ শিবে, বড় মজা হয়েছে। আয়, আগে মোরা এই ঘোড়াটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখে আসি।" এই

বসিয়া, তাহারা ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া বাটীর পার্শ্বস্থিত একটী নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া যেমন সেই ভগ্ন অট্টালিকাটীর দ্বারদেশে আসিবে অমনি দেখিতে পাইল যে একজন সশস্ত্র যুবা সেই বাটীর পার্শ্বস্থিত আম্রকাননের দিকে যাইতেছে। যুবাটীকে দেখিয়াই সর্দ্দার দুজন চিনিতে পারিল। পাঠকবর্গও চিনিয়া থাকিবেন, ইনিই আমাদিগের স্মরদেব বাবু;—বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ এই অট্টালিকার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক্ষণে বৃষ্টির অবসানে গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য অশ্বের অন্বেষণে আম্রকাননাভিমুখে গমন করিতেছেন! সর্দ্দার দুজন স্মরদেব বাবুকে চিনিতে পারিয়াই শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপে, তাঁহাকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার হস্ত পদ বদ্ধ করতঃ সেই আড্ডা-বাড়ীর একটী গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

এ বিষয় পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এদিকে দুলে চারিজন, প্রান্তর মধ্যস্থিত যে বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইয়াছিল, সেখানে আসিয়া সকলে সমবেত হইল।

দ্বিতীয় দুলে কহিল,—'মুই দেখ্‌ব, ও কত বড় বামুন!—ও জানেনা যে, মুই মনে কল্যে ওদের সক্কল্‌কে বাঁধিয়ে দিতে পারি। এখন দেখ্‌ দেখি, সে মেয়েটী কোথা গেল? এ রাত্রে সে কখনই পোলাতে পারে নি। এই গাছের উপরে সে নিশ্চয়ই আছে। যখন সেই কৃষ্ণাণটা খুন হয়, তখন মেয়েটী পাল্কাতে ছিল, বেশ জানি সে আর কোথাও যাই নি। আমরা সকলে মিলে তাকে খুঁজি আয়। একবার ঐ ব্যাটা বামুনকে দেখ্‌তে হবে।

১ম। কোথা খুঁজবো রে?

২য়। ঠিক এই গাছের উপর ঝোপের মধ্যে আছে। তুই উঠ্‌।

১ম। যদি, ভূ—ভূ—তে—পায় রে শালা।

২য়। দূর বেটা,—আবার ভূত! আমরা হচ্চি ভূতের বাবা। আমাদের কাছে আবার ভূত?—নে, ওঠ—ভয় নেই! মুই আছি।

রত্নময়ী এতক্ষণ বৃক্ষের শাখায় বস্ত্রাঞ্চল জড়াইয়া উপরেই অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু সে ভয়ে বিহ্বল, ভাবনায় বিভোর, বৃষ্টীতে সিক্ত-কলেবর—বিবর্ণ—অর্দ্ধমৃত! আহা! ছেলে মানুষ, তাহাতে স্ত্রীজাতি, আবার স্থলের উপর নয়, গাছের উপর কাজেই প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে। এক্ষণে বৃক্ষতলস্থ মানুষের শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার দেহে প্রাণ

সঞ্চার হইল। হৃদয় অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। তাহার তখন আর শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। একটা মানুষের আশ্রয় পাইলেই যেন সে কৃতার্থ হয়। তাই আর বৃক্ষে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, কাতরকণ্ঠে কহিল, "তোমারা বাছা কারা। আমাকে বাঁচাও বাছা। দোহাই তোমাদের বাঁচাও,—আমি তোমাদের মা।"

তখন দ্বিতীয় দুলে আহ্লাদে কহিয়া উঠিল, ঐ দেখ, ঐ দেখ। মোর কথা ঠিক হয়েছে। ভয় নেই মা, ভয় নেই, একটু সবুর কর, মোরা তোমায় নামিয়ে নিচ্চি।

এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে আপন স্কন্ধের উপর দাঁড়াইতে কহিল। প্রথম দুলে সেইরূপ করিলে, দ্বিতীয় বেহারা রত্নময়ীর স্বর লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষের সেই স্থানে গিয়া উঠিল। এবং দ্বিতীয় বেহারার আদেশমতে প্রথম বেহারা আস্তে আস্তে রত্নময়ীকে বৃক্ষ হইতে ভূমিতে আনিয়া নামাইল। তখন সে অর্দ্ধমৃতা। দ্বিতীয় বেহারা তদ্দর্শনে কহিল, "মা, তোর প্রাণের হানি কখনই করবো না। এখন পালকীতে উঠে শুয়ে থাক।"

রত্নময়ী ধীরে ধীরে পালকী আরোহণ করিলেন।

১ম দু। কোথা যাবি এখন?

২য় দু। চ, আমাদের মায়ের ওখানে এখন রেখে আসি। তার পর, কাল সকালে ওঁকে বাটী পাঠিয়ে দেব।—কেমন মা?

রত্নময়ী পাল্কীর ভিতরে আবার সান্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে বসিয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের কথা হয় ত কর্ণগোচর হইল না, অথবা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তখন দুলেরা অনন্তপুর কিম্বা কাঞ্চনপুর এই দুই দিকের কোন দিকে না গিয়া, একেবারে মাঠ পার হইয়া শান্তিপুরে আসিয়া পৌছিল। তাহারা যখন শান্তিপুরে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অনন্তর তাহারা তৎপ্রদেশ-স্থিত একটী নির্জ্জন-স্থানে গিয়া নিকটস্থ একটী পর্ণকুটীরের দ্বারে আঘাত করিল। দুই তিনবার আঘাত করিবামাত্র, কুটীরের ভিতর হইতে বামা কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"কে ডাকে?"—

২য় দু। আমি—রামরূপ!

"রামরূপ?—এমন সময় যে?"

রাম। বড় দরকার। আপনি শিগ্‌গির দোর খুলুন—

তখন একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসীনী কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। অনন্তর বাহকেরা পাল্‌কী নামাইয়া, কুটিরের সম্মুখ ভাগে বসিল।

সন্ন্যা। একি রে?

রাম।—মা! এ পাল্‌কীর ভিতরে একটী মেয়ে আছে, মেয়েটীকে বার করে নিন। তার পর সব ভেঙ্গে বলচি।

তখন সন্ন্যাসিনী "সুর, সুর" বলিয়া ডাক দিল।

তৎক্ষণাৎ কুটীরের মধ্যভাগ হইতে আর একটী নবীনা সন্ন্যাসিনী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে পাল্‌কী খুলিয়া মৃতপ্রায়া রত্নময়ীকে বাহির করিয়া নামাইয়া কুটীরাভ্যন্তরে তৃণ শয্যায় শয়ন করাইল। রত্নময়ীর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে উভয়েই বিস্মিত—স্তম্ভিত! বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "রামরূপ! আবার কোন্ হতভাগিনীকে বনবাসিনী করিতে আনিয়াছিস্?—এর কি মা বাপ কেহ নাই?"—

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীর আকর্ণ-বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারায় অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রামরূপও কাঁদিয়া ফেলিল।—কহিল, "মা, আর কেন মোকে পুরান কথা তুলে লজ্জা দেও?—আমার দোষ কি?—আগে জানলে কি ততদূর হতে দিতাম।"

স। রামরূপ! তোর দোষ কি? তোর কি আমি দোষ দিতে পারি? তোর গুণ আমি জন্মে ভুলবো না। তো হতেই আমি আমার হারামাণিক ফিরে পেয়েছি। তবে এটী কে,—এমন অমূল্যধন তুই কোথা পেলি?

রাম। মা! আগে এর ভিজে কাপড় চোপড় সব ছাড়িয়া দিয়ে, একটু আগুনের সেঁক দেও। আমি একবার ফাঁড়িতে চল্লাম।

এই বলিয়া, রামরূপ অপর তিন জন বেহারাকে সেইস্থানে থাকিতে বলিয়া শক্তিপুরের ফাঁড়ির অভিমুখে চলিল।

সন্ন্যাসিনীদ্বয় রত্নময়ীর আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেক দিতে লাগিলেন।

সূর্য্যোদয় হইলে, রত্নময়ীর চেতনারও উদয় হইল। সে চক্ষুরুন্মীলন

করিয়া দেখিল যে, পর্ণকুটীরে পর্ণশয্যায় সে শায়িতা। নিকটে দুইজন সন্ন্যাসিনী বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। শিরোদেশে আর একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।

রত্নময়ী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল. "আমি কোথায়?"

সন্ন্যাসী গম্ভীর অথচ কোমল স্বরে কহিলেন, "চিন্তা নাই। তুমি সন্ন্যাসীর আশ্রমে আছ, ভয় নাই।"

রত্ন। আ-মা-র—বা-বা-কো-থা-য়?

স। সব আছেন। তাঁদের সংবাদ পাঠাইয়াছি, তাঁরা এলেন বলে। তুমি স্থির হও, একটু বরং নিদ্রা যাও।—এখানে কোনও বাধা নাই।

রত্ন। তারা?

স। কারা?

রত্ন। যারা আমায় নিয়ে এসেছিল——

স। তারা তোমার পিতাকে সংবাদ দিতে গিয়াছে।

রত্ন। বাবা কখন আস্‌বেন।

স। তিনি এখনি আসিবেন। এই এলেন বলে আর কি।

রত্নময়ী আর কোনও কথা কহিল না। রাত্রিতে ঘুম নাই, শরীরে শক্তি নাই. মনে সাহস নাই। এত চেষ্টা করিল ঘুম হইল না, চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিল। পরে কিছু সুস্থ হইলে সেই দিন অপরাহ্নে, সেই বেহারারা তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিল। রত্নময়ী পূর্ব্বরাত্রের ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা তখন পিসীকে কিছুই বলিল না। স্মরদেব বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কেবল "আছেন ভাল বলিয়া সারিয়া দিল। কিন্তু তৎপরদিন সাধুচরণ আসিয়া সমস্তই জানিল। এবং এই ঘটনার ফলাফল পাঠকবর্গ ক্রমে জানিতে পারিবেন।

নৈশ বিহার—মাসী বোন্‌পো।

"ওটী তোমার মন রাখা কথা।"

"আমার, না তোমার?

"মনে ভেবে দেখ না?

"আমি ঠিক দেখেছি।"

"আমিও ঠিক জেনেছি।"

এই বলিবামাত্র প্রাচীরের উপর হইতে "টিক্ টিক্ টিক্" করিয়া একটী টিকটিকি শব্দ করিল।

বরদা। সত্যের টিকটিকি! আমার প্রতি এখন আর তত যত্ন থাকবে কেন? এখন সোমত্ত মাগ,—সোমত্ত মামী! আমি বুড়ো হয়েছি—বয়স গিয়েছে। বলিতে বলিতে চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়িল। সে যা হোক, হর! এখন (স্বোদরের দিকে অধোবদনে চাহিয়া) আমার এটীর উপায় করে দাও। শেষ দশায় কি গলায় দড়ী দেব। আর তোমারও ত এতে কলঙ্ক আছে।

প্রসিদ্ধ করেদের অন্তঃপুরে একটী নির্জ্জন কক্ষে হরনাথ এবং তাঁহার মাসী কথোপকথন করিতেছেন। বরদা, হরনাথ বাবুর মাসী ঠাকুরাণী। বরদার কথার ভাবে বোধ হয় যে, ইনি কোন দায়গ্রস্ত হইয়াছেন।

হিন্দুর ঘরে এবড় কম দায় নয়! যাহাতে মানসম্ভ্রম, লজ্জাসরম, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, যাহাতে স্ত্রীলোকেরা আত্মহত্যা জীব-হত্যা করিতে বাধ্য হয়, ইহা সেই অবৈধ গর্ভসঞ্চার! ধন্য কলির মাসী, ধন্য কলির বোন্‌পো!

মাসী আজ গর্ভবতী। তাই এখন তাঁহার ভাবনা হইয়াছে। এখন উপায় কি, তাই খুঁজিতেছেন। হায়! হায়! হায়! কুকর্ম্ম করার আগে, লোকে যদি একবারটী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখে, তবে আর অধর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্তি হয় না।

হরনাথ বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আবার হাকিম সাহেবকে

আনাইতে হইল আর কি? সে লোকটাকে ডাকিতেও ইচ্ছা করে না, আবার না ডাকিলেও আমার এক দণ্ড চলে না। লোকটা কিন্তু বড় চালাক, খুব বুদ্ধিমান; কেমন মাসী?

"মরণ আর কি?—কালামুখো!—চিরকালই তোর মাসী থাকবো না কি? এখন মাসী বল্‌তে লজ্জা বোধ হয় না?—মর বেহায়া। এখন তোর বাপের মাসী হয়েছি, জানিস্।

এই বলিয়া (মুচকী হাসিয়া, রাগ ঘৃণা প্রণয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া) মাসী ঠাকুরাণী উপযুক্ত বোন্‌পোর দুই গালে দুইটী ঠোনা মারিলেন।

হরনাথ বাবুও তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। তিনিও বরদার চিবুক ধরিয়া, কবির সুরে গাহিয়া উঠিলেন।—

"মাসী আমার মজালে দুকুল।"—

ব। না, হর! আর দেরি করা ভাল দেখায় না। এই বেলা যা হয়, কর! প্রায় দু মাস হতে চল্লো, এখন আর তাচ্ছিল্য করা ভাল হচ্চে না। এই দেখ পেট বেশ উঁচু মালুম হচ্চে! নয় কি?

হর।' না. না। আর দেরী হবে না। আর নিশ্চিন্ত থাক্‌বো না। এইবার যা হয় একটা পরিষ্কার করে ফেল্‌বো। আর দুদিন—

ব। দুদিন দুদিন করে যে, দুশ দিন হয়ে গেল———

হ। এবার আর যাবে না। তুমি বস, তবে আমি এখন আসি।

এই বলিয়া, হরনাথ বসু সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মৃদুমন্দ পদ-সঞ্চালনে শশিবালার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশিবালা, কিশোরি লালের পত্নী, হরনাথের মাতুলানী। হরনাথ যখন শশিবালার ঘরে আসি-লেন, তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। একাকিনী থাকেন জানিয়া, তাঁহার ঘরে প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলে, এবং সে দিন গ্রীষ্মের কিছু আধিক্য থাকায়, দক্ষিণ দ্বারও উন্মুক্ত ছিল। অবৈধ প্রণয় পিপাসুর পক্ষে, সুতরাং, মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, হরনাথ বাবু শশিবালার অনতিদূরে পালঙ্কে ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। মনের উদ্বেগে তখনও চক্ষে নিদ্রানাই, পদ শব্দে, শশিবালা শিহরিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কে গা? (আকৃতি চিনিয়া) এত রাত্রে তুমি এখানে?"

হ। তোমাকে একবারটী দেখিতে আসিলাম।

শ। আমাকে দেখিবার তোমার দরকার ?

হ। কেন, আমি কি তোমার পর ?

শ। তোমাকে কি পর বলছি ? আমি তোমার মামী—মাতৃতুল্য, তুমি আমার ভাগ্নেয়—পুত্রতুল্য।

হ। আবার সেই কথা !—ও কথা কি কখন ছাড়্‌বে না ?

শ। তুমি এ ঘর হইতে চলিয়া যাও।

হ। আমি যাইব না।

শ। আমি লোক ডাকিব।

হ। তুমি জান, কাহার সহিত কথা কহিতেছ ?

শশিবালা বুঝিল যে, এখন জোর করিলে উল্‌টা উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং, গলদশ্রুলোচনে সকরুণবচনে বলিল,—"হর ! আমাকে রক্ষা কর।"

হ। এখন ওসব কথা ছাড়িয়া দেও,—বল, আমার হবে ?

শশিবালা কোন উত্তরই করিল না।—চাপিয়া চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরনাথ পুনর্ব্বার কহিল,—"কৈ, কিছুই বলিলে না যে?—বল আমার হবে। তা হলে আমি তোমাকে আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করবো।—আমার সমস্ত বিষয় তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তুমিই আমার সর্ব্বেসর্ব্বা—মাথার মণি হয়ে থাকবে।" এই বলিয়া হরনাথ বসু, শশিবালার অত্যুন্নত বক্ষের দিকে যেমন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে উদ্যত হইবেন, অমনি তাহার মাতৃস্বসা বরদা রায়বাঘিনীর ন্যায় কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া, হরনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "তবে রে আঁটকুড়ীর বেটা! তোর মামী খুড়ী জ্ঞান নাই।" এই বলিয়া হরনাথকে হড়্‌ হড়্‌ করিয়া টানিয়া লইয়া দ্বারের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। হরনাথের মুখে আর বাক্যটী নাই। শশিবালা লজ্জায়, ভয়ে, অপমানে জীবন্মৃতা! বরদা তখন শশিবালার প্রতি আক্রোশ করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর-নিনাদে ঘর কাঁপাইয়া বলিলেন,—"আরে আবাগির ঝি। তোর ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই ছেলে আর ভাগ্নে কি পর! গলায় দড়ি দিয়ে মর গে যা। ঘরে ঘরে কেলেঙ্কারি? মহাভারত, মহাভারত!! শুনলেও মহাপাপ!"

এই বলিতে বলিতে, বরদা হরনাথ বসুর হাত ধরিয়া আপন গৃহাভিমুখে টানিয়া লইয়া গেল।

বরদা ও হরনাথ চলিয়া গেলে, শশিবালা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিশের নীচে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিশাল-নয়ন-যুগল ফুলিয়া উঠিল লজ্জায়, ঘৃণায়, মনের খেদে, অপমানে শশিবালার ইচ্ছা হইল যে, সেই দণ্ডেই সে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু আবার ভাবিল যে, আত্মহত্যা মহাপাপ আর মরিয়া গেলেও ত, এ কলঙ্ক ঢাকিবে না। হৃদয় কলঙ্কিত না হইলেও লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিতে ছাড়িবে না।—ছিঃ ছিঃ! কি ঘৃণা—কি লজ্জার কথা।—পৃথিবী দুফাঁক হও, আমি তোমাতে লুকাই। আর না, আর না!—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, শশিবালার হৃদয় আরও আকুলিত হইয়া উঠিল। আবার চক্ষে জলধারা বহিল। আবার বালিশে মাথা রাখিয়া, ঘণ্টাখানেক কাঁদিলেন! অবশেষে হঠাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। উঠিয়া, শয্যা উপরে এক তাড়া কাগজ ও এক থলো চাবি পাইলেন। হরনাথ বাবু ভ্রমক্রমে এই কাগজ ও চাবি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বরদার তাড়নায় তিনি এককালে চকিত, আত্মবিস্মৃত ও জড়িত বুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। শশিবালা এক্ষণে সেই চাবির তোড়া হস্তগত করিয়া আস্তে আস্তে—গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিঃশব্দে হরনাথ বসুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। এখন শশিবালার হৃদয়ে অতুল সাহস। অসাধারণ ঐশীশক্তির বলে শশিবালার হৃদয় শক্তিমান। রমণী হরনাথের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, গৃহস্থিত একটী লৌহাধার উন্মোচন পূর্ব্বক, আরও কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া লইয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং পুনর্ব্বার আপন গৃহে আসিয়া আপনার সিন্দুক হইতে আবশ্যকীয় দলিলাদি নিজের অলঙ্কার গুলি, এবং পত্র একখানি বস্ত্রাঞ্চলে জড়াইয়া লইয়া ও একটী কৃষ্ণ পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, মনে মনে পতির চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, পতির উদ্দেশে কহিল,—"প্রাণেশ্বর! যদি তোমার প্রতি আমার একান্ত গতি মতি ও ভক্তি আসক্তি থাকে, যদি সেই পদ ব্যতীত অন্য চিন্তা কখন না থাকে, তা হইলে যে চরণ বলে, এ জীবন, এ সতীত্ব এতদিন রক্ষিত হয়ে এসেছে, অবশ্যই আজ সেই চরণ দর্শন পাইব। মহাপুরুষের বাক্য সিদ্ধ হইবে। আমি কখনই বিধবা নহি। নিশ্চয়ই আমার প্রাণেশ্বর জীবিত আছেন। নিশ্চয়ই আমি তাঁর দর্শন পাব, আর দুই দিন ধরিয়া যে ছদ্মবেশী

মহাত্মা আমাকে পরামর্শ দিতেছেন, অনুরোধ করিতেছেন, "শশিবালা! তুমি যে রজনীতে ইচ্ছা, গভীর নিশীথে দামোদরতীরে আসিবে, সেই রজনীতেই ঘাটে একখানি নৌকা দেখিতে পাইবে। তাহাতে উঠিলে মাঝি তোমাকে তোমার পতির নিকটে লইয়া যাইবে।—আজ এই ভীমা রজনীতে, সেই মহাপুরুষের বাক্যমত, প্রাণেশ্বরের উদ্দেশে, এই পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। দেখি, মহাপুরুষের বাক্য সত্য কি মিথ্যা। যদি ঘাটে তরণী না থাকে, তাহা হইলে, এ পাপ পুরীতে আর প্রত্যাগমন করিব না। প্রাণেশ্বরের চরণ স্মরণ করে, দামোদরের গভীর উদরে, এ জীবন বিসর্জ্জন দিব। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ পশু হরনাথের ও পাপ বিষয়াসক্তি জন্মের মত বিসর্জ্জিত হবে। এই বলিয়া শশিবালা নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবাস্তের পুষ্পবাটিকা দিয়া ক্রমে দামোদর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সন্নিকটে একখানি ক্ষুদ্রতরণী ভাসিতেছে। তরণীর উপরে একজন কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারী যুবা বসিয়া আছে। তদ্দর্শনে শশিবালার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে ঘাটে অবতরণ করিয়া কহিলেন,—কার নৌকা?"

যু। যে যাইতে ইচ্ছা করে।

শ। আমাকে লইয়া যাইবে?

যু। নাম না বলিলে পারি না।

শ। শশিবালা।

যু। তবে আইস।

শ। কোথায় লইয়া যাইবে?

যু। তোমার পতির নিকটে।

শ। বিশ্বাস?

যু। ধর্ম্মের উপর।

শ। তবে চল।

অনন্তর শশিবালা নৌকায় আরোহণ করিলেন। যুবকও ক্ষিপ্র ক্ষেপণী ক্ষেপণে শশিবালাকে লইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

এইরূপে সেই ভীমা রজনীতে করেদের অন্তঃপুর হইতে কিশোরীলালের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী একজন যুবক নাবিকের সহিত অনুদ্দিষ্টা হইল।

পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদিগের আখ্যায়িকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত, ভীমারজনীর সেই কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত ব্যক্তিই—এই শশিবালা।

প্রাতঃকালে সকলে জানিল যে, শশিবালা রাত্রে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কেহ বলিল, "ছুড়িটার স্বভাব বড় খারাপ ছিল; নইলে, বিধবা আবার মাছভাত খায়, না গহনা পরে?"

আর একজন কহিল, "আরে, ছুড়িটার চাউনি দেখেই বুঝ্‌তে পার্ত্তে না যে, ওটা বারফট্‌কা।"—আবার কেহ কেহ বলিল, "নারে, তার ভাতার এসে, কাল্‌রাত্রে তাকে নিয়ে চলে গেছে।"

এইরূপ কত লোকে কত কথা বলিল। বরদা ভাবিল, এতদিনে বাড়ীর বালাই গেল। কিন্তু হরনাথ বাবুর শিরে বজ্রাঘাত হইল। হরনাথ বাবু যখন চাবি আর কাগজপত্র খুঁজিয়া পাইলেন না, তখনই জানিলেন যে তাঁহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। আবার যখন সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া অন্যান্য দলিলপত্র দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার সমস্ত জগৎ শূন্যময় বোধ হইল। আবার এ দিকে বরদার সম্বন্ধে একটা উপায় স্থির করিতে হইবে। পুনশ্চ সেই দিন অপরাহ্নে সংবাদ আসিল যে, সাধুচরণ দে সমস্ত মোকদ্দমা জিতিয়াছে, এবং খরচা বাবুদে তাঁর নামে ডিক্রিজারী করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর দাখিলী দলিলপত্র জাল প্রমাণ হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট নাকি তাঁর নামে ফৌজদারিতে নালিশ রুজু করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এইরূপ বিবিধ অশুভ সংবাদ শ্রবণে চিন্তাজ্বরে হরনাথ বাবু একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। নানা প্রকার দুশ্চিন্তাজালে উৎকট শিরঃরোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

এ দিকে করগোষ্ঠীর পুরাতন গৃহচিকিৎসক হাকিম সাহেব আসিয়া ঠিক সেই সময়ে অনন্তপুরে দেখা দিলেন। হরনাথ বাবু তাঁহাকেই খুঁজিতে ছিলেন। মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল। সুদক্ষ চিকিৎসকের সুচিকিৎসার গুণে ক্রমে বসুজা মহাশয় আরোগ্যলাভ করিলেন। হাকিমের বুদ্ধি আর বসুজার অর্থে জালিয়াতী মোকদ্দমাটা একেবারে ফাসিয়া গেল। তৎপরে, তাহারা স্মরদেব বাবু ও সাধুচরণের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

পাপের ভোগ।—রহস্য উদ্ঘাটন।

স্মরদেব বাবুকে সেইরূপে সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া মধু ও শিবু সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া মধু কহিল,—"দেখ! শিবু, তুই আড্ডাবাড়ীতে থাক, আমি কর্ত্তাকে খবরটা দিয়ে আসি। যেমন একটা দাঁও ফোস্‌কে গেছে, তেমনি অপর একটা জুটেছে।"

শিবু। ভাগ্যিবানের বোঝা ভগা বেটা বয়।

মধু। তবে আমি এই চল্লাম!

এই বলিয়া মধুসর্দ্দার স্মরদেব বাবুর অশ্বটী বাহির করিয়া লইয়া তদারোহণে হাকিম সাহেবের উদ্দেশে যাত্রা করিল। শিবুসর্দ্দার আড্ডাবাড়িতেই শয়ন করিল।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতে মধুসর্দ্দার নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধুকে এবারে অশ্বারোহণে আসিতে দেখিয়া, হাকিম সাহেব কহিলেন, "কি মধু! এবার যে নূতন বেশ। বলি, ঘোড়া পেলি কোথা?"

মধু। এইবারে কাৎলা পাকড়েছি। দৈবাৎ, একটা চুনাপুঁটী পলিয়েছে বৈত নয়, এবার বড় গোছের গেঁথেছি।—সেই মিত্রদের স্মরদেব!

হা। (সহাস্যে) কোথা গাঁথ্‌লি রে?

মধু। ঠিক ঠিকানায়।—নিজের কোটে।

এই বলিয়া মধুসর্দ্দার স্মরদেব বাবুর নিকট হইতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তৎসমুদয় হাকিম সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিল।

হাকিম সাহেব তদ্দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন,—"তবে, মধু একেবারে সাবাড়,—একেবারে ভায়াদের পথে?"

মধু। না, না, ততদূর করিনি। তা হলে রগড় বাধবে কেন? এবার মাছটা খেলাতে হবে। এবার দুজনেরই কিছু কিছু চাই। নইলে কি শেষ যেমন ফাকে পড়েছিলাম, তেমনি আবার হবে?—এবার যেদিকে সুবিধে দেখবো, ঝুঁকবো। কেমন—আপনি কি বলেন?

হা। ঠিক বলেছিস। এবার আর কারও হাতে যাচ্চি না। তায় একটা

শীকার পালিয়েছে। বিশেষ সে হরনাথ বসু আবার মেজকর্ত্তার ঘাড়ে যায়।

মধু। আমিও তাই বল্‌ছিলাম——

সবে মাত্র মধুসর্দ্দার এই কয়েকটী কথা বলিয়াছে, অমনি উমাচরণ পাইক নৌকার উপর হইতে সঙ্কেত সূচক একটা চীৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিকটস্থ জঙ্গলের ভিতর হইতে একদল সশস্ত্র পুলিষ কর্ম্মচারী আসিয়া যুগপৎ হাকিমসাহেব ও মধুসর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। হাকিমসাহেবের মুখে আর বাক্য সরিল না। মধুসর্দ্দার পলাইবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পুলিশ প্রহরীগণের দৃঢ়মুষ্টি এড়াইয়া পলায়ন করা কি তাহার সাধ্য? অনন্তর সকলে সেই বজরায় উঠিয়া বসিল। তখন উমাচরণ নিকটস্থ একজন প্রহরীকে কহিল, "যদু?"

অমনি একজন বরকন্দাজ নিকটস্থ হইয়া করযোড়ে কহিল,—'হুজুর!"

উ। আমার ইউনিফরম্ দাও।

তৎক্ষণাৎ যদু বরকন্দাজ তাঁহাকে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের পরিচ্ছদ প্রদান করিল। তাহা পরিধান করিয়া একখানি রুমাল দ্বারা মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। তখন সকলেই তাঁহাকে দেখিল, সকলেই চিনিল যে, উমাচরণ পাইক অপর কেহ নহে;—অনন্তপুরের প্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ইন্‌স্পেক্টার গোপালচন্দ্র হালদার। ইনিই একদিন মিত্রদিগের মেজকর্ত্তার করকবল হইতে সুরতবালা ও তাঁহার জননীকে নৌকাডুবি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! ইহারই সহায়তায় সুরতবালা একদিন আপন বিষয়বিভব সমস্ত বুঝিয়া পাইয়াছিল। ইনিই ত এতদিন বলদেব ও হরদেব বাবুর হত্যাকাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রকৃত নায়কের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইনিই সেই ডেপুটী বাবু উমাচরণ পাইক সাজিয়া ছদ্মবেশে হাকিম সাহেবের বজরার উপর বিরাজ করিতেছিলেন। উহাঁরই পূর্ব্বসঙ্কেত মত পুলিশের লোকজন গুপ্তভাবে দামোদর তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। বজরায় যে সমস্ত দাঁড়ীমাঝি ছিল, তাহারাও গুপ্তচর। সুতরাং উপস্থিত বিষয়ে তাহারাও তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল।

অনন্তর গোপালচন্দ্র ইন্‌স্পেক্টারের আদেশ মতে মাঝিরা বজরা লইয়া অনন্তপুরে করেদের ঘাটে লাগাইল। বজরা যখন ঘাটে আসিয়া লাগিল, তখন বেলা প্রায় নয়টা। হরনাথ বসু হাকিম সাহেবের প্রত্যাগমনের বিলম্ব

দেখিয়া ঘাটের চাঁদনিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বজরা আসিয়া ঘাটে লাগিল। বজরায় পুলিশ প্রহরী দেখিয়া হরনাথ বাবু যেমন একটা চীৎকার করিয়া বাটীর দিকে দৌড়িয়া পলাইবেন, অমনি সম্মুখ হইতে একদল পুলিশ-প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। এই পুলিশ শক্তিগড়ের ফাঁড়ীর। রামরূপ রত্নময়ীকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে রাখিয়া শক্তিগড়ের থানায় সংবাদ দেয়। শক্তিগড়ের দারোগা চারুবাবু সেই সংবাদ শুনিয়াই, স্বদলে দামোদরের যেস্থানে হাকিম সাহেব অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু গিয়া দেখিলেন যে, বজরা সেখানে নাই, তখন তিনি বরাবর অনন্তপুরের করেদের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াই, সম্মুখে মূল আসামীকে দেখিতে পাইয়া, একেবারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। এদিকে বজরা হইতে দারোগা বাবু হাকিম সাহেব ও মধুসর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করিয়া স্বদলে ঘাটের উপরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়া উভয় ফাঁড়ীর লোক একত্রিত হইয়া আসামী কয়েকজনকে লইয়া, প্রথমে করেদের বাড়ীতে চলিল। এবং সেখানে কয়েকজন প্রহরী পাহারা দিবার নিমিত্ত রাখিয়া, সকলে একেবারে হাকিম সাহেবের পূর্ব্বকথিত আড্ডা-বাড়ীতে গমন করিল। সেই ভগ্ন অট্টালিকাতেই স্মরদেব বাবু অবরুদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে গোপালবাবু ও চারুবাবু, স্মরদেব বাবুর মুক্তিসাধন করিয়া, সেই সমস্ত বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে বাটীর ভিতর কত রকম জাল করিবার যন্ত্র, কত বাক্স, মেকিটাকা এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র বাহির হইল। অনন্তর তাঁহারা আসামী কয়েকজনকে সেই সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত একেবারে আদালতে চালান দিলেন। সেই সঙ্গে শিবুসর্দ্দারও গ্রেপ্তার হইল।

প্রায় তিনমাস ধরিয়া আসামীদিগের বিচার চলিল। বিচারে প্রমাণ হইল যে, হাকিম সাহেব রঘুরাম সা একজন ফেরারী আসামী। অনন্তপুরে আনন্দময়ীর হৌসে ইনিই উমানাথ ভট্টাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া কিছুদিন লোকের সর্ব্বনাশ করেন। পরে যাদব বাঁড়ুয্যে নাম ধারণ করিয়া বলরাম করের পুত্র অনুদ্দিষ্ট কিশোরীলাল করের সহিত কলিকাতায় কারবারে প্রবৃত্ত হন। যে সমস্ত জাল-জালিয়াতি অপরাধে কিশোরীলাল অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার মূল কারণ, এই যাদব বাঁড়ুয্যে, ওরফে হাকিম সাহেব।

কেবল হরনাথ বসুর পরামর্শে, এই হাকিম সাহেবের দ্বারা কিশোরীলালের সর্ব্বনাশ ও সেই সমস্ত জালকাণ্ডের সঙ্ঘটন হইয়াছিল। চারুবাবু, গোপাল ইন্‌স্পেক্টার, রামরূপ সর্দ্দার এবং অপরাপর মাতব্বর সাক্ষ্য দ্বারা সেটী সম্পূর্ণ প্রমাণীকৃত হইল। জাল কাগজপত্র, জাল করিবার উপকরণাদি সমস্তই আদালতে সপ্রমাণ হইয়া গেল। অবশেষে হাকিম সাহেব ও মধুসর্দ্দার আত্মমুখে সমস্ত দোষ স্বীকার করিল। তখন অনুদ্দিষ্ট কিশোরীলালের নাম বিচারালয়ে— লোকালয়ে, সর্ব্বত্রই নিষ্কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল। আদালত হইতে কিশোরীলালের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা খারিজ হইবার হুকুম পাস হইয়া গেল।

পরে দ্বিতীয় দাবী উঠিল যে, এই হাকিম সাহেব ও মধুর্দ্দার ষড়যন্ত্র করিয়া হরদেব বাবুর জীবন বিনাশে সাহায্য করিয়াছিল। আর এই দুজনের দ্বারাই কিশোরীলালের পিতা বলরাম করের বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হয়—সে অপরাধও প্রমাণিত হইল।

তৃতীয় অপরাধ।—কাঞ্চনপুরনিবাসী সাধুচরণ দের বিষয় বেদখল করিবার নিমিত্ত তাঁহার নামে জাল দলিল প্রস্তুত করণ।

চতুর্থ অপরাধ।—কৌশলে সাধুচরণ দের কন্যাকে বাটী হইতে অপহরণ করা এবং স্মরদেব ঘোষকে মন্দ উদ্দেশ্যে একটা বাটীর মধ্যে পুরিয়া রাখা।

হরনাথ বসু এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছেন। অতএব তিনিও এই সকল অপরাধে সম্পূর্ণ অপরাধী। আসামীগণ নিজ মুখে তাহাদের সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। অতএব ১ম আসামী যাদব বাঁড়ুয্যে ওরফে হাকিম সাহেব এবং ২য় আসামী মধুসর্দ্দার ওরফে দেলুখাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং তৃতীয় আসামী হরনাথ বসুর যাবজ্জীবন দীপান্তরের আজ্ঞা হইল। শিবু সর্দ্দার প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি, এই দলভুক্ত ছিল, তাহাদের প্রত্যেকের সাতবৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস হইল। পাপেরও সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

পুলিশের লোকেরা আসামীগণকে গারদে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে চারুবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"সকলে একটু অপেক্ষা করুন, সকলে শুনুন,—এই অর্থলোলুপ নরপিশাচগণ—এই স্বার্থপর পাপাত্মাগণ

এরাও শুনুক, এবং ঐ মহামান্য বিচারপতি উনিও শুনুন আমি কে? যার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এই হরনাথ বসু, আর ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এতদিন চাতুরি খেলিয়া আসিতেছিল, আমিই সেই কিশোরীলাল কর—স্বর্গীয় বলরাম করের আত্মজ। এতদিন ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে আর সত্যের গৌরবে, আমি ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছি। আরও দেখুন, সেই সত্যধর্ম্মের বলেই আমি পুনর্ব্বার আমার মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি সমস্তই প্রাপ্ত হইলাম।"

চারুবাবুর, ওরফে কিশোরীলালের বাক্যাবসান হইতে না হইতেই গোপাল বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ভাই কিশোরী! আমিই তোমার অগ্রজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমি যখন নয়মাস গর্ভে, তখন আমার অসূয়াপরতন্ত্রা মেজজেঠাই আমার মাতার প্রাণ সংহার করিবার জন্য, কৌশলে আমার নিরপরাধিনী জননীকে বনবাসিনী করেন। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, রামরতন আর ইহার পুত্র রামরূপ হইতেই বনমধ্যে আমার মাতার জীবন রক্ষা হয়। আমি বনমধ্যে এক পর্ণকুটিরে ভূমিষ্ঠ হই। পরে এই রামরতনের অনুগ্রহে, আমি প্রতিপালিত হইয়া দশবৎসর বয়সে পুণ্যপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা শশিখের হালদারের হস্তে ন্যস্ত হই। তিনি আমাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। এবং তিনি আমাকে পুলিশ লাইনের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। যখন তুমি নিরুদ্দেশ হইলে, তখন এই রামরতনের মুখে আমার বংশাবলী সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা শুনিলাম। আমারই হস্তে তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা ছিল। কিন্তু যখন শুনিলাম, তুমি আমারই কনিষ্ঠ, এবং মেজজেঠাই যেমন বিষয়ের লোভে আমার সসত্ত্বা জননীর প্রাণসংহারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তেমনই এবারে তাঁহার দৌহিত্র এই হরনাথ বসু কর্ত্তৃক তুমি প্রতারিত ও বিপদগ্রস্থ হইয়াছ। তখন তোমাকে রক্ষা ও আমাদের বিষয়সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশে প্রথমে আমিই তোমাকে কৌশলে ফাঁড়ির দারোগাগিরি-পদে নিযুক্ত করিয়া দিই এবং গোপনে কখন সন্ন্যাসী সাজিয়া, কখন পাইক সাজিয়া, কখন ভিখারী হইয়া এই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য, এই সাতবৎসর কালক্ষেপণ করিয়াছি। তোমার স্ত্রীকে আমিই পাপপুরী হইতে কৌশলে আনাইয়া তোমার করে সমর্পণ করি। অধিক কি বলিব, অনেক কৌশলে, অনেক যত্নে আর অনেক

গুলি অনুগত ব্যক্তির সাহায্যে এতদিনে আমাদিগের সকল পরিশ্রম, সকল আশা সফল হইল।—আমি একদিন গোপনে থাকিয়া এই পাপিষ্ঠ হাকিম ও হরনাথ বসু কর্ত্তৃক সাধুচরণ দের কন্যা হরণের কল্পনা শুনিয়াছিলাম। আমিই লোক দ্বারা স্মরদেব বাবুকে সেই সংবাদ জানাইয়াছিলাম। এবং আমিই সময়ে সময়ে উমাচরণ পাইক সাজিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্য এই পাপিষ্ঠদের দু একটা কার্য্যের সাহায্য করিয়াছিলাম। যা হোক, এক্ষণে সকলে নিষ্কণ্টক হইলাম।

বিচারালয় শুদ্ধ সকলেই নিস্তব্ধ—সকলেই বিস্মিত। কিয়ৎক্ষণ পরে বিচারপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটী সুদীর্ঘবক্তৃতা করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। অনন্তর সকলেই সমস্বরে গোপাল বাবুর অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে এবং তাঁহার অসমসাহসিক কার্য্যদক্ষতার জন্য, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। স্মরদেব বাবু ও সাধুচরণ একেবারে নির্ব্বাক্!

পরে সকলেই বিচারালয় হইতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। জেলদারোগা আসামী কয়েকজনকে লইয়া গারদে পুরিল। কিশোরীবাবু, গোপালবাবু, স্মরদেব বাবু ও সাধুচরণ দে—রামরূপ, রামরতন প্রভৃতি অনুচরবর্গের সহিত অনন্তপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

শেষ কথা—ধর্ম্মের জয়।

অনন্তপুর আজ উৎসবে পরিপূর্ণ। আজ অনন্তপুরের ঘরে ঘরে আনন্দ-ধ্বনি। দীন, দুঃখী, ভিক্ষুকেরা করগোষ্ঠীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, কিশোরী বাবুর জয় গাইতে গাইতে, স্মরদেব বাবুর ধন পুত্র কামনা করিতে করিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া, অনন্তপুরের সেই প্রশস্ত রাজপথ দিয়া চলিয়াছে। কাহারও কক্ষে কাপড়ের মোট, কাহারও মস্তকে মিষ্টান্ন দ্রব্যের হাঁড়ী, কাহারও স্কন্ধে দধিদুগ্ধের ভার।—কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে—কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে করতালি দিতেছে।—চতুর্দ্দিকে উৎসবে হুলুস্থুল। চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল!

অনন্তপুরে আজ এত আনন্দ কিসের?—তা বুঝি পাঠক জানেন না? আজ যে স্মরদেব বাবুর সহিত সাধুচরণ দের কন্যা রত্নময়ীর বিবাহ। কোথা হইতে সুরতবালা আসিয়া নিজ স্বরের বাটির সর্ব্বময়ী গৃহিণী হইয়াছেন।

সুরতবালাই ত গৃহিণী হইবার কথা, তিনি ত এখন স্মরদেব বাবুর সংসারে একমাত্র অভিভাবিকা; তাহারই বিপুল বিষয় সম্পত্তি স্মরদেব বাবুই এতদিন সপ্রতাপে ও সসন্মানে তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসিতেছেন।

গোপালচন্দ্র হালদার কর্ত্তা সাজিয়াছেন। কেন? তাহার এ কর্ত্তৃত্ব কেন? গোপাল বাবু কি সূত্রে এখানে আসিয়া জুটিলেন এবং বরকর্ত্তা হইলেন, পরে বলা যাইতেছে। বিধাতা নিজে জীবগণকে এ সংসার চক্রে ফেলিয়া, কখন কাহাকে কিরূপভাবে ঘুরাইতেছেন, কেহই বলিতে পারে না। যে সুরত, স্বামী বই আর কাহাকেও চিনে নাই—যে সুরত, জ্ঞানবাবুর শত শত প্রলোভনে ও চেষ্টায় বশীভূত হয় নাই, বরং পর-পুরুষের দিকে খড়্গ হস্ত ছিলেন, এখন কিনা সেই সুরত, বিদ্যাসাগরের দোহাই দিয়া, গোপাল বাবুকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বিধবা মতে বিবাহ করিয়াছে। আজ অগাধ ধনের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী সুরতবালার আদরের ও একমাত্র বিশ্বাসের দেবর স্মরদেব বাবুর বিবাহ। তাই অনন্তপুরে এত উৎসব। সুরতবালার হৃদয়ও বড় উচ্চ, তাই তিনি এই বিবাহে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রত্নময়ীকে যৌতুক

দিলেন। আর তাঁহারই বা ভাবনা কিসের? তিনি এখন করেদের অর্দ্ধেক বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী।

শুভ বিবাহ ত চুকিয়া গেল। স্মরদেব বাবু এতদিনে তাঁহার চিরারাধ্য ধন, হৃদয় চিন্তামনী রত্নময়ীকে লইয়া মনের সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সাধুহৃদয় সাধুচরণ কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

করেদের সংসার আবার জাঁকাইয়া উঠিল। বলরাম বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী এতদিন নির্ব্বাসনের পর আবার সংসারপথে প্রবেশ করিলেন। আমরা শক্তিপুরের পর্ণকুটীরে যে বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়াছিলাম, তিনি সেই জ্ঞানদাসুন্দরী—গোপাল বাবুর গর্ভধারিণী। আর যে নবীনা তপস্বিনীকে দর্শন করিয়াছিলাম, তিনি ঐ সুরতবালা। ঐ দেখ না কেন, ফিক্ ফিক্ করিয়া কেমন হাসিতেছেন, আর শশিবালার পৃষ্ঠে স্নেহভরে ধীরে ধীরে মুষ্ট্যাঘাত করিতেছেন!

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, সুরতবালা, জ্ঞান ও মাধবীকে হত করিয়া সেই রাত্রিতেই অনন্তপুর হইতে অনুদ্দিষ্টা হয়েন। কিন্তু সুরতবালা অপর কোথাও যায় নাই। সেই রাত্রিতেই তিনি মনের ঘৃণায়, বিষাদে ও ভয়ে দামোদর গর্ভে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েন। কিন্তু যখন নদীতে ঝম্পপ্রদান করেন, বিধির ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে গোপাল বাবু ছদ্মবেশে কিশোরীলালের স্ত্রীকে লইয়া নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন। তিনি নদীতে একটা মানুষ পড়িল দেখিয়া, অমনি নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে নৌকায় তুলিলেন। তুলিয়া দেখেন, সুরতবালা! যাহাকে তিনি বরাবর—জানি না কিরূপে, কি গুণে মনে মনে ভালবাসিতেন, সেই সুরতবালা! গোপাল বাবুকে দেখিয়াই সুরতবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুরতও গোপাল বাবুকে কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিতে পারি না, তাহাকে বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন, তাই সেই রাত্রের হত্যাকাণ্ডের কথা সমস্তই তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিলেন! তাহার পর গোপাল বাবু সুরতকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিয়া সেই রাত্রিযোগেই তাহাকে শক্তিপুরে লইয়া আসিলেন। এবং যে কুটীরে গোপাল বাবুর জননী জ্ঞানদা বাস করিতেন সেই কুটীরে রাখিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে সুরত সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিলেন। এবং এতদিনে জ্ঞানদার

সহিত তপস্বিনীবেশে কাল কাটাইয়া এক্ষণে আবার সংসার পাতাইয়া—আবার সংসারকর্ম্মে—সংসারধর্ম্মে—ব্যাপৃত হইলেন।

এই সংসারে বৃদ্ধ পরিচারক রামরতন হইতেই জ্ঞানদা, গোপাল বাবুর ও সুরতবালার জীবন রক্ষা হয়। রামরূপ রামরতনের পুত্র।—সেই ইহাদের রক্ষক হইয়া এতদিন শক্তিপুরে বাস করিতেছিল। কিন্তু এতদিনে বিধাতা সুপ্রসন্ন হইয়া সকলকেই কুল কিনারা দেখাইয়া দিলেন।

বাড়ীর মেজবউএরও মৃত্যু হইয়াছিল। এক্ষণে বড়বউ, শশিবালা, জ্ঞানদা, কিশোরীলাল, জ্ঞানদা-পুত্র গোপালচন্দ্রকে পাইয়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। বুড়ীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। এতদিনের যে দারুণ পাষাণ তাহার হৃদয়ে চাপান ছিল, আজ তাহা অপসৃত হইল। বসুমতী, পুত্রের দ্বীপান্তর ও কিশোরী, গোপালচন্দ্র এবং জ্ঞানদার পুনঃপ্রকাশসংবাদ শ্রবণে লজ্জা, অভিমান ও দুঃখে ইতিপূর্ব্বেই বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বরদা ভ্রূণহত্যা করিতে গিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ও বিচারে তিনবৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ হইলেন। আর হরেনাথ বাবুর স্ত্রী বিরাজমোহিনী?—তিনি বাবুর প্রিয় খানসামা রমাচণ্ডালের সহিত কাঞ্চনপুরে কিছুদিন অনন্তলীলা করিয়া পরিশেষে কলিকাতায় কুমারটুলীতে আসিয়া ঘরভাড়া করিলেন। কুলত্যাগিনী কুলকামিনীকে পরিণামে কুলোহাতে করিয়া গোলাঝাড়ুণী হইতে হইল।

আর পতিব্রতা জ্ঞানবতী সতী জ্ঞানদা, জোড়া বেটা, জোড়া বউ লইয়া লনের সাধে নির্ব্বিবাদে কাল কাটাইতে লাগিলেন। রামরতন, রামরূপ প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ উপযুক্ত বৃত্তিভোগী হইয়া করেদের সংসারেই রহিল! গোপাল বাবু কিছুদিন পরেই পেন্‌সন লইলেন। কিশোরীলাল (ওরফে) চারুবাবু ক্রমে প্রতাপান্বিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অনন্তপুরে নানা উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্টে তাঁহার নাম যেমন চারুবাবু ছিল, তেমনই রহিয়া গেল।

সমাপ্ত।

নূতন গীতাভিনয়! নূতন গীতাভিনয়!! নূতন গীতাভিনয়!!!

প্রখ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর যশ প্রণীত—

সুধন্বা-সংহার

বা

হংসধ্বজের মহামুক্তি।

(আমা সঙ্গীত সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত।)

(মূল্য ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১৷৷০ দেড় টাকা।)

সুধন্বা কে—তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সুধন্বা অর্জ্জুন হইতেও শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বালকবীর বাহুবলে যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বাসনায় রাজা হংসধ্বজ সুধন্বাকে বৈষ্ণব সাজে সজ্জিত করিয়া সমরে বিদায় দেন; রণ গমনোদ্যত প্রিয় পতির মুখ চাহিয়া প্রভাবতীর হৃদয়ভেদী করুণ সঙ্গীত! তদনন্তর মায়ার মায়ায় ও ধর্ম্মের ছলনায় সুধন্বা পণভঙ্গ দোষে দোষী হইয়া অনলময় উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হইলে রাজা ও রাণী উন্মাদ প্রায় হইবেন—সে অংশ অতীব ভীষণ! অবশেষে সেই ব্রজভক্ত সুধন্বার অনলময় উত্তপ্ত তৈলকুণ্ড মধ্যে থাকিয়া হরিধ্বনি! পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বীর ভক্তের রণে গমন। ভক্তে ভক্তে মহারণ! ভক্তিযুদ্ধে ভক্ত বীরের মুক্তিলাভ। যুদ্ধ সজ্জায় প্রভাবতীর রণস্থলে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রবোধ দান ও সুধন্বার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রদর্শন করাওন প্রভৃতি অতি মধুর ভাবে বিরচিত।

(উপহার ১। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, ২। মজা-না-সাজা।)

জয়দ্রথ-বধ গীতাভিনয়।

জয়দ্রথ বধ—বীররস, ভক্তিরস ও করুণরসের সিন্ধু! ইহার বক্তৃতা ও গান ভাবময়—মর্ম্মস্পর্শী এবং উদ্দীপনা পূর্ণ। অন্যায় সমর নিহত অভিমন্যু শোকানল দগ্ধ বিশ্বজেতা অর্জ্জুনের হৃদয়ভেদী বিলাপ! পরে প্রতিহিংসা সংসাধনের জন্য রৌদ্ররস মিশ্রিত "জয়দ্রথ বধের" কঠোর প্রতিজ্ঞা! পাণ্ডব নয়নমণি অভিমন্যুর অঙ্কলক্ষ্মী সরলা সোণার প্রতিমা উত্তরার বিধবা বেশ! পাণ্ডব সমক্ষে বিধবা সাজে সাজিয়া উত্তরার আগমন ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রশ্নোত্তর! ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের উদ্‌ভ্রান্তভাবের অন্তর্দ্দাহকর শোকানল মিশ্রিত বক্তৃতা! পরে জয়দ্রথ পত্নী দুঃখলার পতিব্রতধর্ম্মের জলন্ত পরিচয়! যুধিষ্ঠিরের পবিত্রাধিক পবিত্র ভাব পূর্ণ উদারতা! ইহা একান্ত মধুর! জয়দ্রথ বধ প্রণেতা জয়দ্রথ বধে সুধাস্বাদ ফলাইয়াছেন। উৎকৃষ্ট গ্লেজ কাগজে সুন্দর ছাপা। মূল্য ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১।০ পাঁচসিকা।

গুপ্ত-রত্ন।

যদি অল্প পয়সায় স্বদেশী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া লাভবান হইবার সাধ থাকে, তবে এই গুপ্ত-রত্ন পুস্তক খানি ক্রয় করুন। ইহাতে হরেক রকম কালী, সাবান, এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোন, গোলাপ জল, পমেটম, আতর, দিয়াশালাই, বিস্কুট, দন্তমঞ্জন, বিবিধ প্রকার সিরাপ, কাচ, কাচের বাসন, এনামেলের বাসন, কাগজ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী। সুতা, পাট, রেশম, ধাতু প্রভৃতিকে রং করিবার উপায়, কেমিকেল স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রস্তুত প্রণালী, গিল্‌টীর নিয়ম, বিবিধ প্রকার প্যাটেণ্ট ঔষধ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় অতি সহজে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

সাধক প্রবর শ্রীশ্রীজ্যোতিষানন্দ ভাগবৎ প্রণীত—

কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব।

ইহাতে কি কি আছে ?

গৌরাঙ্গ অবতারের পূর্ণত্ব স্বীকার—কৃত নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারায় সপ্রমাণ। কলিযুগে হরিনাম যজ্ঞ প্রশস্ত কি না? নিষ্কাম ও সকাম ভক্তিযোগের লক্ষণ কিরূপ ? প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে ? কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে স্বর্গলাভ বাঞ্ছনীয় কি না ? গোপীভাব ও গোপীযজ্ঞ কিপ্রকার, প্রাণায়াম প্রণালী কিরূপ ? মাধুর্য্যভাব শ্রেষ্ঠ কি না, ব্রাহ্মণ কে ?—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি? কৃষ্ণভক্ত নীচকুলোদ্ভব হইলেও পুজ্য কি না, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীকাগণের সম্বন্ধ নির্ণয় ও রাসলীলার উদ্দেশ্য বর্ণন, প্রতিমা পূজাদি নিষ্কাম উপাসনা কি না এবং কৃষ্ণ প্রীতির উপায় অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। বিলাতি বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

অতীব বিস্ময়কর! অতীব লোমহর্ষণকর !! অতীব চমকপ্রদ !!!

আহত গোয়েন্দা।

(বিলাতি বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা।)

ভয়ঙ্কর হত্যাঘটনা সম্বলিত ডিটেক্‌টিভ বিভীষিকা! ছত্রে২ ভয়প্রদ ঘটনা! নর-নারী-হন্ত্রী মতিয়া বেগমের কথায় কথায় ছল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন। এই তীক্ষ্ণধার কিরীচের চাক-চিক্যতা শোণিতের তরঙ্গমালা, অনাশ্রিত অনাশ্রিতার কাতর চিৎকার, আবার তখনি তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তখনি আবার সুন্দরীর মধুর অধরে সুধার হাসি, মনোমদ প্রণয়ালাপ। শিখিবার, বুঝিবার ও মজিবার ঘটনাবলী সুন্দররূপে চিত্রিত। মূল্য ১৲ টাকা।

বিক্রেতা—শ্রীকানাইলাল শীল।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—কলিকাতা।